জানুয়ারি ২০০৫ দশ টাকা

আনন্দমেলা

রোমাঞ্চকর রঙিন কমিক্‌স

মরুভূমির অভিশাপ

প্রথম কিস্তি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জমজমাট উপন্যাস

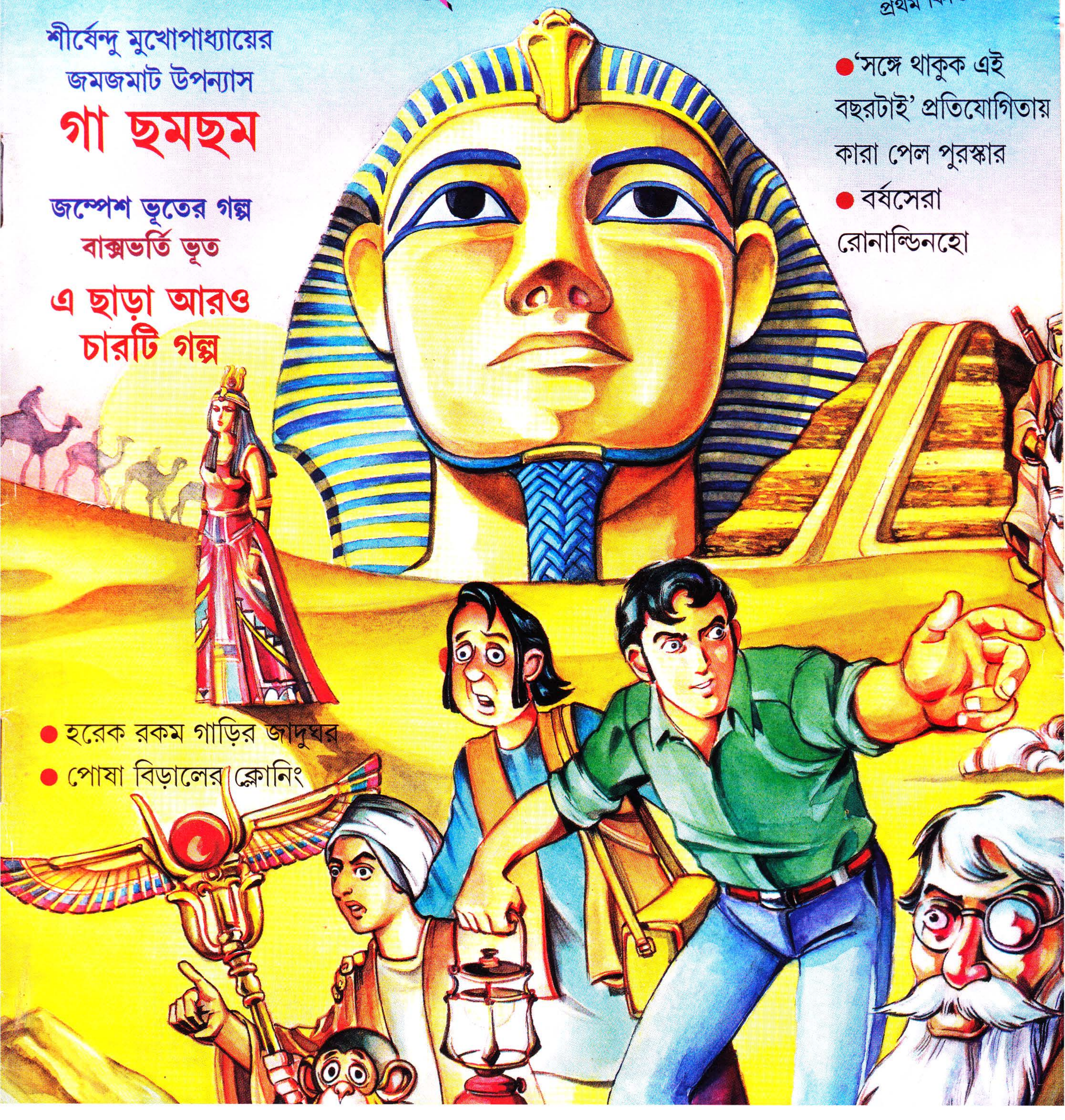
গা ছমছম

জম্পেশ ভূতের গল্প

বাক্সভর্তি ভূত

এ ছাড়া আরও চারটি গল্প

- 'সঙ্গে থাকুক এই বছরটাই' প্রতিযোগিতায় কারা পেল পুরস্কার
- বর্ষসেরা রোনাল্ডিনহো



- হরেক রকম গাড়ির জাদুঘর
- পোষা বিড়ালের ক্লোনিং



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

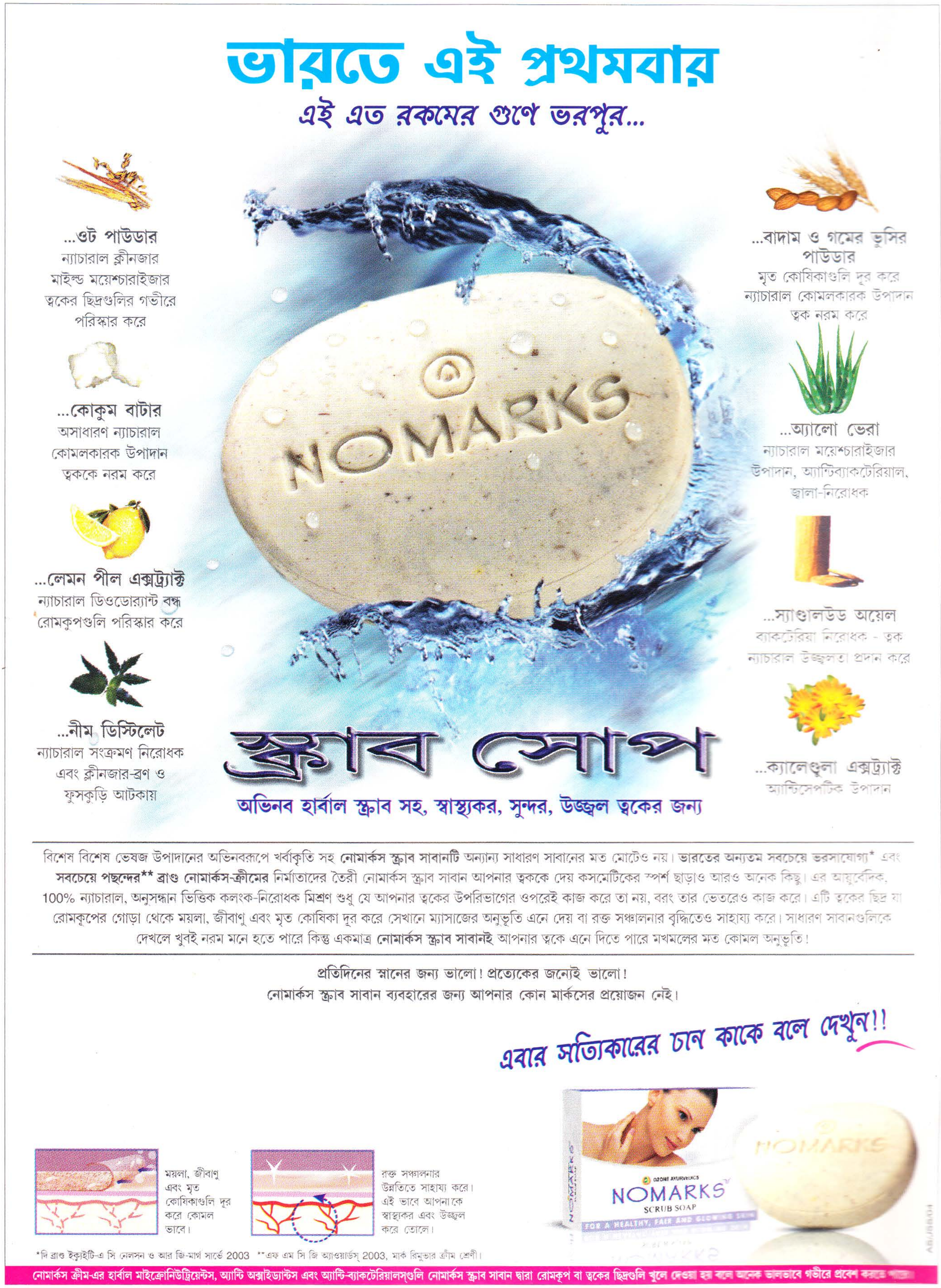
হার্ডকপি ওঁ স্ক্যান ঃ অভিষেক দে

এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

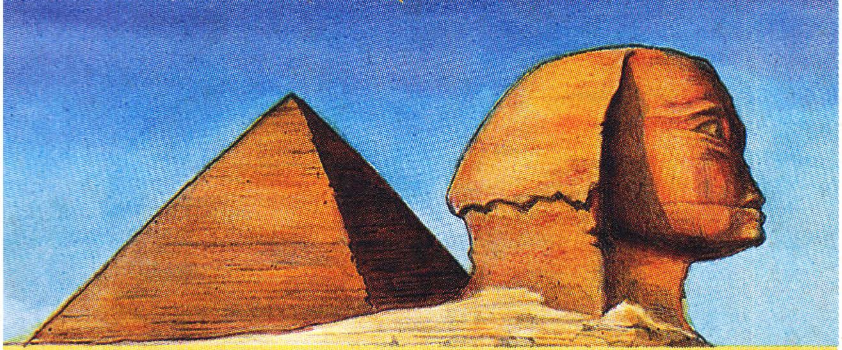
e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


ভারতে এই প্রথমবার
এই এত রকমের গুণে ভরপুর...
...ওট পাউডার
ন্যাচারাল ক্লীনজার
মাইল্ড ময়েশ্চারাইজার
ত্বকের ছিদ্রগুলির গভীরে
পরিস্কার করে
...কোকুম বাটার
অসাধারণ ন্যাচারাল
কোমলকারক উপাদান
ত্বককে নরম করে
...লেমন পীল এক্সট্র্যাক্ট
ন্যাচারাল ডিওডোর্যান্ট বন্ধ
রোমকুপগুলি পরিস্কার করে
...নীম ডিস্টিলেট
ন্যাচারাল সংক্রমণ নিরোধক
এবং ক্লীনজার-ব্রণ ও
ফুসকুড়ি আটকায়
...বাদাম ও গমের ভুসির
পাউডার
মৃত কোষিকাগুলি দূর করে
ন্যাচারাল কোমলকারক উপাদান
ত্বক নরম করে
...অ্যালো ভেরা
ন্যাচারাল ময়েশ্চারাইজার
উপাদান, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল,
জ্বালা-নিরোধক
...স্যাণ্ডালউড অয়েল
ব্যাকটেরিয়া নিরোধক - ত্বক
ন্যাচারাল উজ্জ্বলতা প্রদান করে
...ক্যালেণ্ডুলা এক্সট্র্যাক্ট
অ্যান্টিসেপটিক উপাদান
NOMARKS
স্ক্রাব সোপ
অভিনব হার্বাল স্ক্রাব সহ, স্বাস্থ্যকর, সুন্দর, উজ্জ্বল ত্বকের জন্য
বিশেষ বিশেষ ভেষজ উপাদানের অভিনবরূপে খর্বাকৃতি সহ **নোমার্কস স্ক্রাব সাবানটি** অন্যান্য সাধারণ সাবানের মত মোটেও নয়। **ভারতের অন্যতম সবচেয়ে ভরসাযোগ্য*** এবং **সবচেয়ে পছন্দের** ব্রাণ্ড নোমার্কস-ক্রীমের** নির্মাতাদের তৈরী নোমার্কস স্ক্রাব সাবান আপনার ত্বককে দেয় কসমেটিকের স্পর্শ ছাড়াও আরও অনেক কিছু। এর আয়ুর্বেদিক, 100% ন্যাচারাল, অনুসন্ধান ভিত্তিক কলংক-নিরোধক মিশ্রণ শুধু যে আপনার ত্বকের উপরিভাগের ওপরেই কাজ করে তা নয়, বরং তার ভেতরেও কাজ করে। এটি ত্বকের ছিদ্র বা রোমকূপের গোড়া থেকে ময়লা, জীবাণু এবং মৃত কোষিকা দূর করে সেখানে ম্যাসাজের অনুভূতি এনে দেয় বা রক্ত সঞ্চালনার বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। সাধারণ সাবানগুলিকে দেখলে খুবই নরম মনে হতে পারে কিন্তু একমাত্র **নোমার্কস স্ক্রাব সাবানই** আপনার ত্বকে এনে দিতে পারে মখমলের মত কোমল অনুভূতি!
প্রতিদিনের স্নানের জন্য ভালো! প্রত্যেকের জন্যেই ভালো!
নোমার্কস স্ক্রাব সাবান ব্যবহারের জন্য আপনার কোন মার্কসের প্রয়োজন নেই।
এবার সত্যিকারের চান কাকে বলে দেখুন!!
ময়লা, জীবাণু এবং মৃত কোষিকাগুলি দূর করে কোমল ভাবে।
রক্ত সঞ্চালনার উন্নতিতে সাহায্য করে। এই ভাবে আপনাকে স্বাস্থ্যকর এবং উজ্জ্বল করে তোলে।
OZONE AYURVEDICS
NOMARKS
SCRUB SOAP
FOR A HEALTHY, FAIR AND GLOWING SKIN
*দি ব্রাণ্ড ইক্যুইটি-এ সি নেলসন ও আর জি-মার্গ সার্ভে 2003 **এফ এম সি জি অ্যাওয়ার্ডস্ 2003, মার্ক রিমুভার ক্রীম শ্রেণী।
নোমার্কস ক্রীম-এর হার্বাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, অ্যান্টি অক্সাইড্যান্টস এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়ালসগুলি নোমার্কস স্ক্রাব সাবান দ্বারা রোমকূপ বা ত্বকের ছিদ্রগুলি খুলে দেওয়া হয় বলে অনেক ভালভাবে গভীরে প্রবেশ করতে

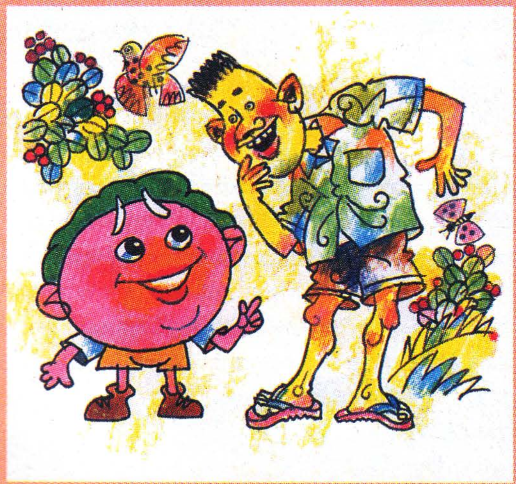
আনন্দমেলা

৩০ বর্ষ ৯ সংখ্যা পৌষ ১৪১১ জানুয়ারি ২০০৫

রঙিন কমিক্স (প্রথমাংশ) **মরুভূমির অভিশাপ ৪৬**



চার হাজার বছর আগে মরুভূমিতে গড়ে উঠছে এক স্টেপ পিরামিড। এমন সময় উঠল ভয়ানক এক মরুঝড়। সাংবাদিক নীলের বাড়িতে এসে হাজির হলেন প্রোফেসর গোমেজ। তিনি বললেন, তাঁর ভীষণ বিপদ। যে-কোনও সময় তিনি নাকি খুন হয়ে যেতে পারেন। হঠাৎ পাওয়া গেল একটা প্যাপিরাস লিপি। কী লেখা আছে ওই লিপিতে? এক রহস্যময় আতঙ্ক তাড়া করে ফিরছে প্রোফেসরকে। এমন সময় একজন লোক এল প্রোফেসরের খোঁজে। কী ঘটল এরপর? গল্প ও ছবি: **কৌশিক কুণ্ডু।**



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

ভুতুড়ে উপন্যাস

গা ছমছম ৩৪

ময়নাগড়ের শান্তির দিনগুলোর মধ্যে এসে উদয় হয়েছে হিজিবিজি নামের একজন ছেলে। সে নাকি ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়। উদ্ধববাবুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ উধাও সে। উদ্ধববাবুর ধারণা, হিজিবিজি হল ভূত। এমন সময় পাঁচুর সামনে এসে দাঁড়াল একটা ছেলে। পাঁচু তাকে বলল, গুপ্তধনে তার কোনও লোভ নেই। ময়নাগড়ের সব ভূতের কাণ্ডকারখানাও তার জানা। পাঁচু বলল, বোকা লোকেদের নাকি ওই একটাই সুবিধে। যা দেখে তাই বিশ্বাস করে। পাঁচু তার নাম জানতে চাইতে ছেলেটি বলল, সে হিজিবিজি। সে নাকি বোকা লোকই খুঁজে বেড়াচ্ছে। ময়নাগড়ে একজন গুণী চোর আছে। তার নাম টকাই। নিঘিন্নে চোরদের দলে টকাইকে ফেলা যায় না। সে কখনও ছাপোষা গেরস্তের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেয় না। কী করে সে? তার পর কী ঘটতে লাগল? জানা যাবে দ্বিতীয় কিস্তিতে।

অন্যান্য পাতায়

গল্প

খেলাধুলো

প্রচ্ছদ: কৌশিক কুণ্ডু

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক: অভীক সরকার।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

ভাল লাগল পূজাবার্ষিকী

এবারের পুজোসংখ্যা পড়ে বেশ ভাল লাগল। ‘ফেলুদা কমিক্স’ আর ‘সাইবার অপরাধ’ মন কেড়ে নিয়েছে আমার। তবে কাকাবাবুর গল্পে কাকাবাবুর ছবিটা মোটেই মানানসই হয়নি। আমরা কাকাবাবুর বয়স সাধারণত চল্লিশ বছরের বেশি ভেবে থাকি। কিন্তু এখানে ছবিতে কাকাবাবুর বয়স মনে হচ্ছে তিরিশের কম। এই ছবিটিতে আমি কাকাবাবুর অভিজ্ঞতালব্ধ মুখটি খুঁজে পাইনি।

সৌরভ গোস্বামী
আগরতলা, ত্রিপুরা

কেরালায় কিস্তিমাত

আনন্দমেলা শারদীয়া সংখ্যায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘কেরালায় কিস্তিমাত’ উপন্যাসে একটি ভুল তথ্য দেখলাম। সেটা হল, দারচিনি গাছের শুকনো পাতাই তেজপাতা। কিন্তু দারচিনি ও তেজপাতা দুটি আলাদা-আলাদা গাছ থেকে পাওয়া যায়।

স্বর্ণেন্দু ভুইঞা
দ্বিতীয় বর্ষ, বি কম
সাউথ সিটি কলেজ

অপেক্ষায় থাকি



আমি ‘আনন্দমেলা’র নিয়মিত পাঠক। ছোটদের মাসিকপত্র আনন্দমেলা দিন-দিন আকর্ষক হয়ে উঠছে। আমরা প্রতি মাসে দু’তারিখে আনন্দমেলা হাতে পাই। এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি সারা মাস। আনন্দমেলার প্রতিটি গল্প, উপন্যাসই খুব ভাল। ‘বিজ্ঞানের টুকিটাকি’ বিভাগটি আমার খুব ভাল লাগে। ‘নানারঙের রামধনু’ বিভাগ আমাদের মতো পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয়। টিনটিন কমিক্স বহুদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার অনুরোধ, এই কমিক্সটিকে যেন আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

সমীরণ মোদক
অষ্টম শ্রেণি
গাঁড়াপোতা উচ্চ বিদ্যালয়

সম্পাদকীয় উত্তর: টিনটিনের সমস্ত কমিক্সই ‘আনন্দমেলা’য় প্রকাশিত হয়েছে। টিনটিনের স্রষ্টা হার্জে যেহেতু আর বেঁচে নেই তাই টিনটিনের নতুন কমিক্সও আর হবে না। তাই আমরাও আর টিনটিনের কমিক্স প্রকাশ করতে পারব না। টিনটিনের সমস্ত কমিক্সের বই ‘আনন্দ পাবলিশার্স’-এ পাওয়া যায়।

দেবীপূজার পদ্মফুল

গত নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যা ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকায় রঞ্জন প্রসাদের লেখা ‘দেবীপূজার পদ্মফুল’ গল্পটিতে একটি ছোট্ট ভুল চোখে পড়ল। গল্পের প্রথম দিকে বলা হয়েছে “...গর্জন করে উঠলেন তমোহরণ চক্রবর্তী, পুজোর প্রধান পুরোহিত।” আবার তার খানিকক্ষণ পরেই বলা হয়েছে, “...দুঃখহরণ চক্রবর্তী পুরোহিতের কাজ করেছেন। এখন তাঁর হাতেই দায়িত্ব।” দু’জায়গায় দু’রকম নাম কেন? গল্পে দু’জনেরই অস্তিত্ব বোঝাতে হলে এই দু’জনের মধ্যে সম্পর্ক কী, সেটা জানতে চাই।

স্বাধীনা কোলে
অষ্টম শ্রেণি
শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

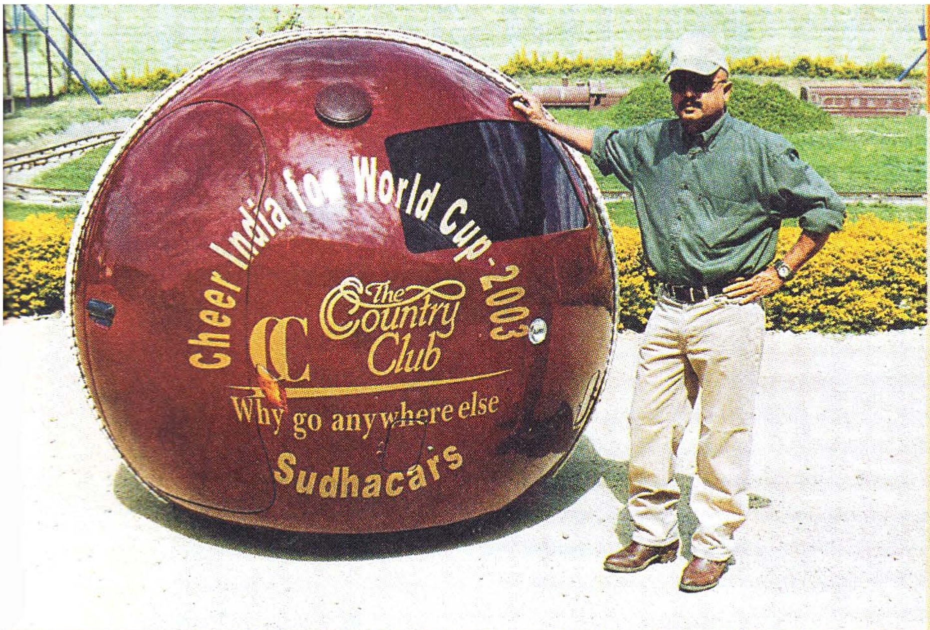
সম্পাদকীয় উত্তর: ‘দেবীপূজার পদ্মফুল’ গল্পে বলা হয়েছে— “তারপর এ-বাড়িতে অনেকদিন তাঁর পিতৃদেব দুঃখহরণ চক্রবর্তী পুরোহিতের কাজ করেছেন। এখন তাঁর হাতেই দায়িত্ব।” এখানে ‘তাঁর হাতেই দায়িত্ব’ অর্থে লেখক তমোহরণ চক্রবর্তীর কথাই বলেছেন।

চালু থাক ডাকবাক্স

আমি ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা। এই পত্রিকার কমিক্স ও উপন্যাস পড়তে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। কিন্তু ‘রোবো পুলিশ’ উপন্যাসটি ভাল লাগেনি। এ ছাড়া একটা অভিযোগ আছে আমার। গত কয়েকটি সংখ্যা ধরে ‘ডাকবাক্স’ বিভাগটি বন্ধ আছে কেন? আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা আগামী সংখ্যা থেকে ডাকবাক্স বিভাগটি আবার চালু করুন।

বরনমাল্য ভট্টাচার্য
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়
বিবেকনগর, ত্রিপুরা

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পারো ‘ই-মেল’-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

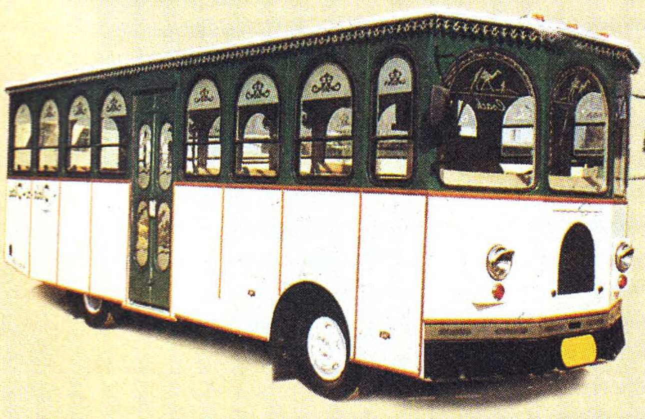


কোনওটা কলম, কোনওটা বা পদ্মফুল, হেলমেট অথবা কাপডিশ। এগুলো সবই এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ি। এরকম অদ্ভুত সব গাড়িতে ভর্তি কে. সুধাকরের মিউজ়িয়াম। লিখেছেন **বেদদ্যুতি চক্রবর্তী**

আজব গাড়ির মিউজ়িয়াম

কোনওদিন যদি দ্যাখো কলকাতায় রেড রোডের উপর দিয়ে ভট-ভট করে চলছে একটা কাপডিশ কিংবা দু'মিটার ব্যাসের আস্ত একটা ডিউজ় বল, তা হলে অবাক হোয়ো না। কারণ, হায়দরাবাদের যুবক কে. সুধাকর এরকম অদ্ভুত-অদ্ভুত চেহারার সব গাড়ি তৈরি করে চলেছেন নিজের হাতে। গড়ে তুলেছেন বিশ্বে এক এবং অদ্বিতীয় বিচিত্র সব গাড়ির মিউজ়িয়াম। এই মিউজ়িয়ামের সমস্ত গাড়িই তাঁর নিজের হাতে তৈরি। এখানে আছে শিবলিঙ্গ, কম্পিউটার, ক্যামেরা, অ্যাটাচি, কলম, বেগুন, জুতো, পদ্মফুল, হেলমেট, বার্গার। এগুলো প্রত্যেকটাই এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মোটরগাড়ি। গতিবেগ ঘন্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার। দু'মিটার ব্যাসের আস্ত একটা ডিউজ় বল-গাড়ি তিনি তৈরি করেছিলেন ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে মাথায় রেখে। তাঁর এই অভিনব উদ্যোগকে বাহবা দিয়েছিলেন কপিলদেব। এ ছাড়া আড়াই ইঞ্চি উঁচু সাইকেল কিংবা সাড়ে ১৩ ইঞ্চি উঁচু মোটরবাইকও সুধাকরেরই তৈরি। এই মোটরবাইকের গতিবেগ ঘন্টায় ৩০ কিলোমিটার। সুধাকর তৈরি করেছেন ছোট আকৃতির লাল রঙের একটি দোতলা যান। যানটিকে সবচেয়ে ছোট মানুষের ব্যবহারযোগ্য ডবল ডেকার বাসের মর্যাদা দেওয়া যায় কি না ভেবে দেখছে গিনেস বুক। ৪০ ফুট উঁচু একটি তিন চাকার সাইকেল তৈরি করছেন সুধাকর। এটাকে গিনেস বুক যে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সাইকেলের মর্যাদা দেবেই, সে ব্যাপারে সুধাকর নিশ্চিত। তাঁর স্বপ্ন, হায়দরাবাদের নেকলেশ রোডে ওই ৪০ ফুট উঁচু সাইকেলের উপর উঠে ভারতের পতাকা ওড়ানো।





পাঠকের পাতা

গত সংখ্যার প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'সঙ্গে থাকুক এই বছরটাই'। এই বিষয় নিয়ে ১০ লাইনের মধ্যে গদ্য লিখে পাঠাতে বলেছিলাম আমরা। অনেকেই সুন্দর লেখা পাঠিয়েছ। তোমাদের পাঠানো লেখা থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসেবে বেছে নিয়েছি আমরা তিনটি লেখা। সেই তিনটি লেখা ছাপা হল এই সংখ্যায়। সেইসঙ্গে ছাপা হল আরও কয়েকটি চমৎকার লেখাও।

এবারের প্রতিযোগিতা

'পাঠকের পাতা'য় প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠানো লেখা থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসেবে তিনটি লেখা বেছে নিয়ে আকর্ষক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই এই বিভাগে পাঠকদের লেখার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঠিকানা (পিনকোড ও টেলিফোন নম্বরসহ) অবশ্যই পাঠাতে হবে। এই সংখ্যায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছ, লেখার সঙ্গে তোমরা তোমাদের বাড়ির সম্পূর্ণ ঠিকানা পাঠিয়েছিলে। আমরা তোমাদের পুরস্কার শিগগির পাঠিয়ে দেব। এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় 'কবিতা লেখো'। আমরা কবিতার দু'টি লাইন 'আপেল যদি সূর্য হত/কমলালেবুর চাঁদ', লিখে দিলাম। তোমাদের লিখে পাঠাতে হবে আরও ছ'টি লাইন। স্কুলের যে-কোনও ছাত্রছাত্রী, যারা ফোর থেকে এইট-এ পড়ো, তারাই লিখে পাঠাতে পার। কবিতাটি হতে হবে মৌলিক এবং অপ্রকাশিত। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে কবিতাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে হবে। সেরা তিনটি কবিতা ছাপা হবে 'আনন্দমেলা'য়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি কবিতাও ছাপা হবে। কবিতা ২০ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।

'কবিতা লেখো প্রতিযোগিতা'
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০১

✻ প্রথম

২০০৪ সালের আয়ু আর মাত্র কয়েকটা দিন, এই কথাটি সেদিন রাতে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। ঘুমের দেবী যে কখন এসে আমার দু'চোখে জগতের সমস্ত ঘুম ভরে দিয়ে চলে গেছেন, তা আমি নিজেও জানি না। হঠাৎ আমি নিজেকে আমার কম্পিউটারের সামনে আবিষ্কার করলাম। কম্পিউটারের পরদায় তখন খোলা রয়েছে মজাদার ওয়েব সাইট 'আবোল তাবোল ডট কম' এবং তাতে লেখা রয়েছে একটি অদ্ভুত ছড়া।

মজার বছর দু' হাজার চার
করে না নিয়মের কোনও কেয়ার
১২ মাসেও হয় না শেষ
আহা বেশ বেশ বেশ !

এই নামগোত্রহীন ছড়াটার মাথামুন্ডু না বুঝতে পেরে আমি নীচের লেখা পড়লাম এবং জানতে পারলাম যে, আমার কথা ভেবে আবোল তাবোল ডট কম ২০০৪ সালের মেয়াদ আরও ১২ মাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এ তো একেবারে জল না চাইতেই আইসক্রিম। আসলে পরীক্ষার জন্য এবার আমার বার্থডে পার্টিটা ভন্ডুল হয়ে গেছে। আবোল তাবোল ডট কমের সৌজন্যে আমি সেই ঘাটতিটা সহজেই পুষিয়ে নিতে পারব। তা ছাড়া পাব এক বছরে দু'বার দুর্গাপুজো, দেওয়ালি, বড়দিন পালন করার মস্ত সুযোগ। এতসব মজা আর আনন্দের কথা ভেবে আমি ঘুমের ঘোরেই 'ইয়াহু' বলে লাফিয়ে উঠলাম।

দিব্যেন্দু পাল
সপ্তম শ্রেণি
সোদপুর হাই স্কুল

✻ দ্বিতীয়

এই বছরটা সঙ্গে থাকলে সুবিধে এবং অসুবিধে দুটোই হবে। অসুবিধে হবে, একই ক্লাসের পড়া আরও এক বছর পড়তে, একই ক্লাসরুমে গিয়ে বসতে, পুরনো হয়ে যাওয়া বইগুলো পড়তে। নতুন বছর না এলে নতুন করে আগের বছরের সব ভুলভ্রান্তি শুধরে নিয়ে নতুন প্রতিজ্ঞায় জীবন শুরু করা যাবে না। পুরনো বছর সঙ্গে থাকলে নতুন পড়া মুখস্থ করতে হবে না। সেজন্য রোজ স্কুলে না গেলেও চলবে। খেলার সময় বেশি হবে, পড়ার সময় কম। দুর্গাপুজো আর-একবার হবে তো? না, পুরনো বছরে একবার হয়ে গেছে বলে, আর হবে না। যদি দুর্গাপুজোর ছুটি, শীতের ছুটি দু'বার করে পাওয়া যায়, তা হলে নতুন বছর না এলেও আপত্তি নেই। যদি তা না হয় তবে, এই বছর সঙ্গে থাকার দরকারই নেই।

সৌরীশ বসু
পঞ্চম শ্রেণি
বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা

✻ তৃতীয়

তোমরা তো বলছ এই বছরটাকে ১২ মাসের জন্য বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়। আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগবে না। নতুন বছর না হলে নতুন ক্লাসে উঠব কী করে? নতুন বইখাতা পাব না, নতুন বন্ধুও পাব না। আবার তা হলে ক্লাস ফাইভেরই তিনটে পরীক্ষা দিতে হবে। পুজোগুলো তো আর পাব না। নতুন জামাকাপড় হবে না, মজাও হবে না। ২০০৪-এর শেষ উৎসব বড়দিন, তা হলে এরপর আর কোনও উৎসবও পাব না। নিউ ইয়ার ডে-তে কোথাও ঘুরতেও যেতে পারব না। বন্ধুদের নতুন বছরে নিজের হাতের তৈরি গ্রিটিংস কার্ডও দিতে পারব না। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল, মা তা হলে আমার এগারো বছরের জন্মদিনও পালন করবেন না।

পারমিতা বসু
পঞ্চম শ্রেণি
দ্য নর্থ এন্ড মর্ডার্ন স্কুল
কলকাতা ৭০০ ০৩৩

এই বছরটাকে আরও ১২ মাসের জন্য বাড়িয়ে দিলে খুবই আনন্দ হত আমার। হোলিতে রং মাখাবার মজাটা আবার ফিরে পেতাম। সরস্বতী পুজোর দিন সারাটা দিন খেলার সুযোগ পেতাম। এপ্রিল মাসে স্কুলের টানা গরমের ছুটিটা আবার উপভোগ করতে পারতাম। সবার উপরে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পুজোটা আবার ফিরে পেতাম। কালীপুজো আর ভাইফোঁটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখ একটাই হত যে, পরীক্ষাগুলোও আবার দিতে হত।

রাজর্ষি মান্না
সপ্তম শ্রেণি
সেন্ট টমাস হাই স্কুল, দাশনগর, হাওড়া

বছরটা যদি ১২ মাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হলে ২৪ মাসে এক বছর। কিন্তু এক থেকে ১২ নম্বর মাসের নামকরণ তো করা হয়েছে। অথচ ১৩ থেকে ২৪ নম্বর মাসের নামকরণ করা হয়নি। এই মাসগুলোর নামকরণ নিয়ে শুরু হবে সে এক মজাদার খেলা।
তা ছাড়া, বছরটা যদি ১২টি মাসের জন্য বেড়ে যায় তা হলে আমি বা আমরা সকলেই একটি বেশি পুজোবার্ষিকী এবং ১২টি বেশি 'আনন্দমেলা' মাসিক পত্রও পাব।
এবছরের ১২টি মাস যদি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে, তা হলে ফিরে আসবে দুর্গোৎসব ও দীপাবলি।
এই বাড়তি দুর্গাপুজো ও দীপাবলির অবসরে আমরা আবার বেরিয়ে পড়তে পারব হিমাচল প্রদেশের বদলে মধ্যপ্রদেশে কিংবা রাজস্থানে। একই বছরে ডবল ঘোরা, সত্যি, খুবই মজা হবে।

পল্লবী মণ্ডল
পঞ্চম শ্রেণি
দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

এই বছরটাকে যদি আরও ১২টা মাস বাড়িয়ে দেওয়া যেত, তা হলে আমার মতো আনন্দ পৃথিবীতে আর কারও হত না। আমাদের স্কুলটা ফোর পর্যন্ত। এরপর ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অন্য স্কুলে যেতে হবে। আমার প্রিয় বন্ধুরাও একই স্কুলে পাবে কি না কে জানে! আর ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে বলে মাঠের খেলা, আনন্দমেলা পড়া, কার্টুন দেখা সব বাতিল। হিজিবিজির জন্মদিনে যাওয়া তা হলে বাতিল হবে না। কেননা, পরীক্ষার তো অনেক দেরি!

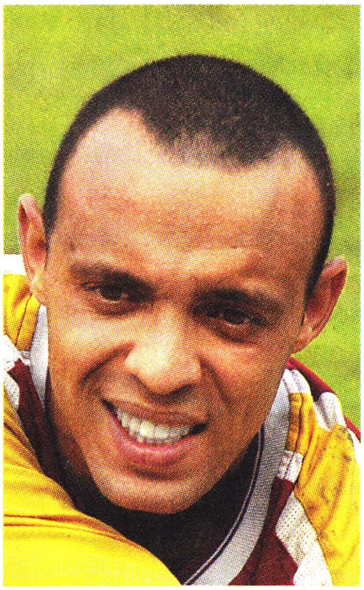
দিগন্ত দত্ত
চতুর্থ শ্রেণি
বিবেকভারতী শিশু শিক্ষা সদন

আনন্দমেলা দিল বর,
জবর জবর এক বর,
সঙ্গে থাকুক এই বছর।

অভিনব ও আকর্ষক প্রস্তাব, আমি পুরোপুরি একমত। কিন্তু একমত হলেও স্পষ্ট কথা, এ বিষয়ে আমার একটু বাছবিচার আছে এবং সেটা নিয়েই এই বছরটাও সঙ্গে রাখতে চাই। পুরনো দিনকে মানুষ মনে রাখতে চায় আনন্দ ও খুশি পাওয়ার জন্য। তাই এই বছরের আনন্দ ও মজাগুলোকেই আমি সঙ্গে রাখতে চাই। খারাপ, অভিমান আর দুঃখের বিষয়গুলোকে সঙ্গে নেব না, কিন্তু রেখে দেব স্মৃতির সিন্দুকে। সঙ্গে নেব ছুটির দিনগুলো, নেব স্কুলের সকল মজা ও হইহুল্লোড় মেশানো দিনগুলো, সারা বছরের যত উৎসব, পালাপার্বণ ও ঘুরে বেড়ানোর দিন পেয়েছি, তাদেরকেও সঙ্গে নেব এই সুযোগে। পুরনো শ্রেণিটাকে নেব না, কিন্তু সঙ্গে নেব বন্ধুদের এবং পরীক্ষার ভাল ফলগুলো।

ধ্রুবজ্যোতি সেনগুপ্ত
চতুর্থ শ্রেণি
পাঠভবন প্রাথমিক বিভাগ
কলকাতা ৭০০ ০১৯

এই বছরটা যদি নতুন করে পাই, তবে প্রথমেই শুধরে নিতে পারি এই বছরে করে আসা



ক্রিশ্চিয়ানো ডি লিমা জুনিয়র

ভুলগুলো। যেগুলো বছরের শেষে এসে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। তাদের নতুন করে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, যারা এই বছরে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বিশেষ করে বিদেশ থেকে খেলতে আসা জুনিয়রকে। যদি ওই ম্যাচ নতুন করে শুরু করা যেত, তবে হয়তো তাঁকে খেলতে নিষেধ করতাম। আমাদের প্রিয় বড়দি, যিনি সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন আমাদের বিদ্যালয় থেকে, তাঁকেও হয়তো কয়েকটা মাসের জন্য নতুন করে ফিরে পেতাম। আর-একটা সাল, যেটা কয়েকদিন পরেই পৃথিবীর খাতায় লেখা হয়ে যাবে, অতীত হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য, তাকে হয়তো ফিরে পেতাম আর-একবার।

সুকন্যা দেবনাথ
অষ্টম শ্রেণি
সালকিয়া কেদারনাথ বাবুলাল রাজগড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া

২০০৪ সালটাকে যদি আরও ১২টা মাসের জন্য ধরে রাখা যেত, তবে খুব মজা হত। নতুন বছর মানেই তো নতুন পড়া, আর 'আনন্দমেলা' পড়ার সময় একটুখানি। কিন্তু এই বছরটাই সঙ্গে থাকলে পুরনো পড়া তাড়াতাড়ি পড়ে নিয়ে আনন্দমেলা অনেক বেশি সময় ধরে পড়তে পারতাম। আমার ছোট ভাইটাও নতুন বছর এলে উঁচু ক্লাসে উঠে যাবে, আর আনন্দমেলা পড়ার সময় কম পাবে। আমি নতুন বছর এলে আরও উঁচু ক্লাসে উঠে যাব, ফলে আনন্দমেলা পড়ার সময়টা তো আরও কম পাব। তাই এই বছরটা সঙ্গে থাকলে আমরা আমাদের আনন্দপূর্ণ দিনগুলো ফিরে পাব। কিন্তু একটা বছরকে তো আর দু'বছরের জন্য ধরে রাখা যাবে না!

ঋতুপর্ণা সাহা
সপ্তম শ্রেণি
তারাসুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
নবদ্বীপ, নদিয়া

আরও ১২টা মাস। উরিব্বাস! এই বছরটাই সঙ্গে থাকলে কেমন হয় তা তো ঠিক বুঝতেই পারছি না। কিছু-কিছু ব্যাপার যে খুবই ভাল হয়, তা অবশ্য হলফ করে বলতে পারি। কোন ব্যাপার? তবে শোনো, ঘাড়ের উপর তো এসেই পড়েছিল বার্ষিক পরীক্ষাটা। এদিকে পাড়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্টটাও এখন মাঝপথে। আমাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী 'ইলেভেন বুলেটস'কে এবার হারাতেই হবে। আর এসব করতে গিয়ে পড়াশোনা শিকেয়। তাই বছরটা বেড়ে গেলে? হুররে। বলটার সঙ্গে পরীক্ষাটাও বাউন্ডারি পার। আবার মন খারাপও কি হচ্ছে না? মাসতুতো দাদা বাপ্পার বিয়েটা ছিল নতুন বছরের শুরুতে। কী মজাটাই না করতাম! সেটাও তো পিছিয়ে যাচ্ছে একটা বছর। তা হলে। তা হলেও বলি বারবার, সঙ্গে থাকুক ২০০৪।

অরণ্যসোম মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি
পাঁচাল উচ্চ বিদ্যালয়

হিজিবিজি আনন্দমেলা CLUB

জন্মদিন জমজমাট

মিলেনিয়াম পার্কে হিজিবিজির জন্মদিনে দারুণ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আনন্দমেলা ক্লাব।

সবুজে ঘেরা চারদিক। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। শীতের বেলা। হালকা রোদের ছোঁয়ায় এদিন মিলেনিয়াম পার্ক ছিল জমজমাট। অসংখ্য ছোট ছেলেমেয়ে; তাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, সেইসঙ্গে দর্শকদের ভিড়ে মেতে উঠেছিল পার্কের গ্যালারি। আনন্দমেলা ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল দারুণ এক অনুষ্ঠান, 'জন্মদিন জমজমাট'। আসলে এ হল হিজিবিজির জন্মদিন। হিজিবিজির জন্মদিনের কথা অজানা ছিল না আনন্দমেলার খুদে পাঠকদের। আর তাই ১৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় হইহই করে সবাই হাজির হয়েছিল মিলেনিয়াম পার্কে।

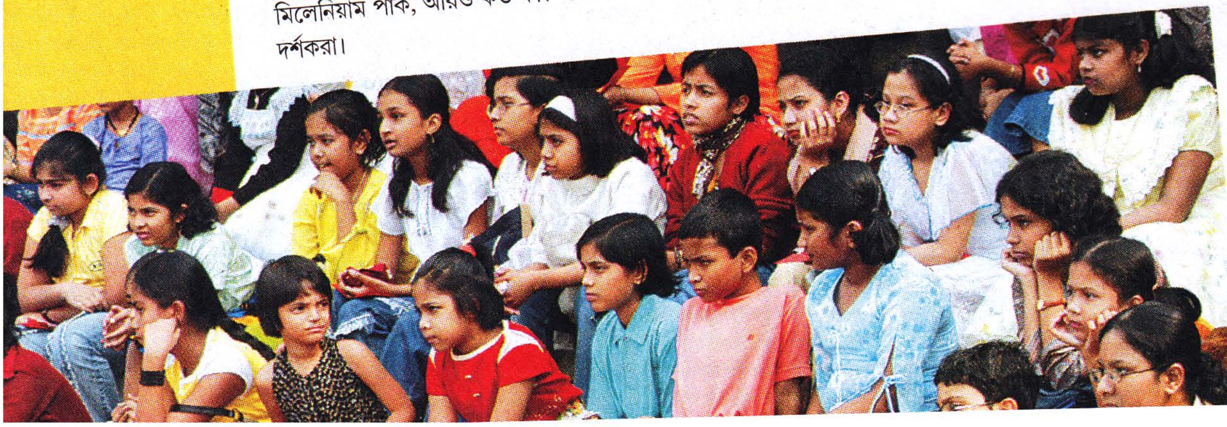
'গুপী বাঘা ফিরে এল,' 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'ফটিকচাঁদ' ছবিতে জাগলিং দেখিয়েছিলেন যিনি, সেই অভয় মিত্রর জাগলিং দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। তাঁর হাতের শৈল্পিক ছোঁয়ায় মুগ্ধ সবাই। বেশ কঠিন অথচ মজাদার সব খেলা দেখিয়ে অভয়বাবু যখন শেষ করলেন অনুষ্ঠান, হাততালির বন্যা বয়ে গেল চারপাশে। একটু পরেই এলেন জাদুকর রাজেন রায় (জুনিয়র)। জাদুকর ম্যানড্রেকের মতো পোশাক পরে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলেন তিনি। প্রতিটি ম্যাজিকই অসাধারণ। দেখালেন দড়ির ম্যাজিক। রুমালের ভিতর থেকে অবলীলায় বের করে আনলেন খরগোশ। থলের ভিতর থেকে বেরোতে লাগল একের-পর-এক টাকার নোট। এরকম অজস্র ম্যাজিক—মিস্টিরিয়াস স্লেট, ওয়াটার অফ মিলেনিয়াম পার্ক, আরও কত কী। ম্যাজিক দেখে অভিভূত খুদে দর্শকরা।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। এবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি শুরু করলেন 'পাসিং দ্য পার্সেল' খেলা। মিউজিক বাজতে শুরু করল। তারপর টিফিন বাক্সের মতো একটা বাক্স দেওয়া হল গ্যালারিতে বসে থাকা কোনও একটি বাচ্চার হাতে। শুরু হল হাতবদল। একজনের হাত থেকে আর-একজন, তার হাত থেকে পাশের জন...। মিউজিক থামামাত্র বাক্স হাতে বাচ্চাটিকে কাছে ডাকলেন কৌশিক। বাক্সের ভিতরে থেকে ছোট্ট কাগজের মোড়ক। তাতে যা লেখা থাকবে তাই করে দেখাতে হবে ছোটদের। কাউকে এক পায়ে লাফাতে-লাফাতে পৌঁছে যেতে হল নিজের জায়গায়। ঝালমুড়ি বিক্রি করা দেখাল কেউ। কেউ বা নকল করল চার্লি চ্যাপলিনকে। এই মজার খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই পেল হিজিবিজির ছবি আঁকা সুন্দর একটি টি-শার্ট।

হিজিবিজির জন্মদিনে কেক না থাকলে হয়? তাই বিশাল এক কেক রাখা ছিল আগে থেকেই। ছোট্ট-ছোট্ট হাতে কেক কাটল ছোটরা। হাততালি, সেইসঙ্গে ছবি উঠল প্রচুর। হিজিবিজির



জন্মদিনে কেক খেয়ে ছোটরা তো খুশি সবাই। কুইজ় দিয়ে শেষ হল অনুষ্ঠান। কেমন কাটাল সবাই হিজিবিজির জন্মদিনে? শুধু ছোটরা নয়, সঙ্গের বড়রাও খুশি খুব। তাঁরা জানালেন, "খুব ভাল লেগেছে অনুষ্ঠান।" শিবপুর বি ই মডেল হাই স্কুলের ক্লাস সিক্সের সুস্মিতা সরকার, যোধপুর গার্লস-এর ক্লাস ওয়ানের সুদিতি সাহা বা বেহালা শীলপাড়ার সৌম্যজিৎ কুণ্ডুর মতে মাঝে-মাঝেই হওয়া উচিত এরকম প্রোগ্রাম।



জয় সেনগুপ্ত

হিজিবিজির জন্মদিনে যোগ দেওয়ার জন্য আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের ৫০ শব্দের একটি লেখা পাঠাতে বলা হয়েছিল। লেখার বিষয়: (১) হিজিবিজি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, কারণ... (২) আমি যদি হিজিবিজি হতাম... (৩) হিজিবিজির তিনটি ইচ্ছে... । অজস্র লেখা তোমরা পাঠিয়েছ আমাদের দপ্তরে। তার মধ্য থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটি লেখা ছাপা হল এই সংখ্যায়।



হিজিবিজির জন্মদিনে ম্যাজিকে মাতিয়ে দিলেন রাজেন রায় (জুনিয়র)

হিজিবিজি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, কারণ...

হিজিবিজি দারুণ মজার ছেলে। হিজিবিজি খুব ফুর্তিবাজ। ও খেতে ভীষণ ভালবাসে। আমার সঙ্গে ওর মনের খুব মিল। হিজিবিজি বন্ধুদের প্রতি চিরকালই খুব দিলদরিয়া। বন্ধুঅন্ত প্রাণ বলতে যা বোঝায় আর কী! ও জীবনের সব আনন্দ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভালবাসে। বন্ধুদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে তাদের পাশে দাঁড়ায়।

অন্বেষা রায়
অষ্টম শ্রেণি
সাউথ সাইড গার্লস হাই স্কুল, খড়্গপুর

হিজিবিজির সঙ্গে আমার মনের এবং মতের খুব মিল। অনেক দিনের বন্ধু হিজিবিজিকে আমি মনপ্রাণের সব কথাই বলি। ও ওর ছোট্ট মস্তিষ্ক দিয়েই আমার নানা সমস্যার সমাধান করে। পেটুকটা একবার আমার জন্মদিনে এসে অর্ধেকেরও বেশি কেক খেয়ে ফেলেছিল। ওর জন্মদিনে হাজির থাকব, আর লক্ষ রাখব যাতে গোটা কেকটা সাবড়ে না ফেলে। দেদার মজা হবে সেদিন।

অভীক সেন
দশম শ্রেণি
সেন্ট পল্‌স মিশন, কলকাতা

হিজিবিজি অনায়াসে ছোটদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এবং খুব ভাল বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। তার মনটা খুব সরল। সে ছোটদের খুব ভালবাসে। হিজিবিজি গান গাইতে ও গান শোনাতে খুব ভালবাসে। সে খেতেও খুব ভালবাসে।

সায়নী নাগ
ষষ্ঠ শ্রেণি
শিবপুর ভবানী বালিকা বিদ্যালয়

আমি যদি হিজিবিজি হতাম

যদি হিজিবিজি হতাম তা হলে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে বাতাস ভরে, উড়ে-উড়ে চাঁদ, তারা, সুর্য্যিমামার সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে নিতাম, হ্যারি পটারের জাদুর কৌটোটা নিয়ে দোকানের সব চকোলেট, আইসক্রিম খেয়ে লোপাট করে দিতাম। রাস্তার ফুটপাতে থাকে যেসব শিশুরা, তাদের কষ্ট লাঘব তো করতামই, আর রবি ঠাকুরের 'লুকোচুরি'র মতো মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতাম।

শ্রেয়সী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম শ্রেণি
সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দির
সিউড়ি, বীরভুম

আমি যদি হিজিবিজি হতাম, তা হলে যখন যেখানে খুশি উপস্থিত হয়ে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সজাগ দৃষ্টি দিতাম, যাতে যেখানে-সেখানে কেউ নোংরা না ফেলে। এ ছাড়া জলের অপচয় বন্ধ করতাম। যেখানে পুকুর, জলাশয় আছে সেগুলো যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে নজর দিতাম। সবাইকে নিয়ে চারপাশে গাছ লাগাতাম। বিকলাঙ্গ পথশিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালা করতাম।

রুশা চক্রবর্তী
দশম শ্রেণি
সত্যনারায়ণ অ্যাকাডেমি, বাঁকুড়া

হিজিবিজির তিনটি ইচ্ছে

প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না-কিছু ইচ্ছে থাকে। তাই সবাই তাদের ইচ্ছেপূরণ করার চেষ্টা করে। আমি মনে করি হিজিবিজির জীবনেও কিছু ইচ্ছে আছে। যেমন, (১) দুষ্টুমিষ্টি কার্টুন চরিত্র হয়ে থাকা, (২) ছোটদের আনন্দ দেওয়া, (৩) নতুন-নতুন খাবার খাওয়া। আমি আশা করি, তার এই ইচ্ছেগুলো যেন পুরণ হয়।

শ্রুতি মুখোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি
হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা

(১) সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা হিজিবিজির বন্ধুরা সবাই যেন খু-উ-ব ভাল থাকে, সুন্দর স্বপ্ন দেখে আর সব্বাইকে ভালবাসে। (২) পৃথিবীর সব বড়রা যেন পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে, একটুও ঝগড়া যেন তারা না করে। (৩) জন্মদিনের বিরাট বড় চকোলেট কেকটা যেন কোনওদিনই না ফুরোয়।

অমৃতা ভৌমিক
সপ্তম শ্রেণি
বারাসাত কালীকৃষ্ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বি জ্ঞা নে র টু কি টা কি

মিশন 'টেম্পল ওয়ান'

কী দিয়ে তৈরি আমাদের সৌরজগৎ? পৃথিবীর প্রথম প্রাণের স্পন্দন কী হয়েছিল কোনও ধূমকেতু থেকে আসা উপাদানের সাহায্যেই কি? এরকম আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে পৌঁছে যেতে হবে ধূমকেতুর গভীরে। আর তাই নাসার বিজ্ঞানীরা 'ডিপ ইমপ্যাক্ট'কে পাঠাচ্ছেন মহাকাশে। ২০০৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এই মহাকাশযানটি ফ্লোরিডার কেপ কানাভেরাল থেকে যাত্রা শুরু করবে ধূমকেতু 'টেম্প্‌ল ওয়ান'-এর উদ্দেশে। সবকিছু যদি ঠিকঠাক চলে তা হলে জুলাই মাসের চার তারিখে টেম্প্‌ল ওয়ানের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে ডিপ ইমপ্যাক্ট। ওই সময় ডিপ ইমপ্যাক্ট থেকে বেরিয়ে আসবে 'ইমপ্যাক্টর' নামে একটি স্পেস প্রোব। তারপর ঘণ্টায় ৩৭,০০০ কিলোমিটার গতিবেগে টেম্প্‌ল ওয়ানের উপর আছড়ে পড়বে স্পেস প্রোবটি। সৃষ্টি হবে বিশাল এক গর্ত অর্থাৎ ক্রেটার। ক্রেটারটির গভীরতা হবে প্রায় ১৪ তলা বাড়ির মতো, আর চওড়ায় একটা ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান। বিস্ফোরণের ফলে ইমপ্যাক্টর ধ্বংস হয়ে গেলেও ধূমকেতুর গভীরের অজানা সব ছবি পাঠাতে থাকবে সে। একই সঙ্গে ছবি তুলতে থাকবে ডিপ ইমপ্যাক্টও। প্রতিটি ঘটনা মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে হাব্‌ল, স্পিৎজার এবং চন্দ্র টেলিস্কোপ। আর হাওয়াইয়ের মউনা কিয়া-র মতো অত্যাধুনিক সব টেলিস্কোপ থেকে পৃথিবীতে বসে এই দুর্লভ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবেন বিজ্ঞানীরা।



শিল্পীর কল্পনায়: ডিপ ইমপ্যাক্ট (ডান দিকে) থেকে স্পেস প্রোব বেরিয়ে এসে ছুটে যাচ্ছে টেম্প্‌ল ওয়ান-এর দিকে

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ম্যাজিক

বাড়ির পোষা প্রিয় পোষ্যটি মারা গেছে? দুঃখ করার কিছু নেই, প্রাণের চেয়েও প্রিয় ওই জীবটির হুবহু একটি নকল তুমি পেয়ে যেতে পার। তবে তার জন্য কষ্ট করে যেতে হবে আমেরিকায়। কারণ, অর্ডার দিলে ক্লোনিং করে তোমার পোষা মৃত ওই কুকুর বা বিড়ালটির একটি 'যমজ' তৈরি করে দেওয়া এখন কোনও ব্যাপারই নয় আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছে। আর তাই প্রিয় প্রাণী হারানোর দুঃখ থেকে বেঁচে গেলেন আমেরিকার টেক্সাস-এর বাসিন্দা জুলি। তাঁর অতি প্রিয় বিড়াল নিকি ১৭ বছর ধরে ছিল তাঁর কাছে। গত বছর মারা গিয়েছিল নিকি। আর তারপরই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ম্যাজিক দেখালেন বিজ্ঞানীরা। নিকির ডি এন এ সংগ্রহ করে তাঁরা তৈরি করে ফেললেন আর-এক নিকিকে। এ যেন সেই আগের নিকিরই যমজ। জুলি এর নাম দিলেন লিট্‌ল নিকি। নিকিকে পেতে জুলির খরচ হয়েছে ৫০,০০০ ডলার। "নিকি আর লিট্‌ল নিকি— দু'জনের চরিত্র একদম এক। নিকি জল খুব ভালবাসত, যা একটা বিড়ালের কাছে একেবারেই অস্বাভাবিক। লিট্‌ল নিকিরও জল খুব প্রিয়। সুযোগ পেলেই আমার বাথটবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও," বলেছেন জুলি। লিট্‌ল নিকির বয়স এখন ন'সপ্তাহ। উপরের ছবিতে জুলির কোলে দেখা যাচ্ছে ফুটফুটে ছোট্ট লিট্‌ল নিকিকে।



আশ্চর্য জুতো

চেকোস্লোভাকিয়ার এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন অদ্ভুত এক জুতো। যাঁরা দৃষ্টিহীন, এই জুতোর সাহায্যে সব কিছুই 'দেখতে' পাবেন তাঁরা। আসলে দেখতে পাবেন বললে ভুল হবে, রাস্তাঘাটে কোথায় কী আছে তা বুঝতে পারবেন তাঁরা। ব্যাপারটা ঘটবে তাঁদের পায়ের সাহায্যে। খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে ব্যাপারটা? বিজ্ঞানী আন্তনিন কাসপারার আবিষ্কৃত এই বিশেষ ধরনের 'ভাইব্রেটিং' জুতোর তলায় রয়েছে বিশেষ প্রযুক্তির এক সোল। এই সোল ইনফ্রারেড লাইটের বিম পাঠাতে থাকবে প্রতিনিয়ত। যে-কোনও বস্তু থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা আলো ধরে ফেলার জন্য এই জুতোয় আছে এক বিশেষ ধরনের সেন্সর। দৃষ্টিহীন মানুষটির সামনে কোনও জিনিস থাকলে তার থেকে ছিটকে আসা আলো ওই সেন্সরটি ধরে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেবে জুতোর মধ্যে থাকা বিশেষ একটি যন্ত্রের কাছে। আর তারপরেই থরথর করে কাঁপতে থাকবে জুতোর সোল এবং দৃষ্টিহীন ব্যক্তিটি জেনে যাবেন তাঁর আশপাশে থাকা বস্তুগুলোর অবস্থান।

জয় সেনগুপ্ত

অনুমতি ছাড়া স্নানে বারণ

এত কিছু থাকতে স্নান করার মতো সামান্য ঘটনা যে কারও দু'চক্ষের বিষ হয়ে উঠতে পারে তা ত্রয়োদশ লুইয়ের জীবনী না পড়লে বিশ্বাস



করা যাবে না। এই ফরাসি সম্রাটকে একবার বাধ্য হয়ে স্নান করতে হয়েছিল। তারপর কী যে হল, তিনি এমন খেপে গেলেন যে, সারা দেশে তিনি স্নান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন! পুকুর, নদী, সমুদ্র তো ছার, নিজের বাড়িতেও কেউ আর স্নান করতে সাহস পেত না। স্পেনের রানি ইসাবেলা জীবনে দু'বার বাধ্য হয়ে স্নান করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে ধর্মযাজকরা স্নানের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। সেন্ট বেনেডিক্ট তো স্নান করাকে 'পাপ' বলে ধিক্কার দিতেন। সেন্ট গ্রেগরি ঘোষণা করেছিলেন যে, শুধু রবিবার একবার স্নান করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার কয়েকটি জায়গায় স্নান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ১৮৪২ সালে কেউ যদি স্নান করতে চাইতেন, তা হলে তাঁকে পৌর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হত।

নাক-কাটা বিজ্ঞানী

টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) ছিলেন একজন প্রতিভাধর জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সবসময় রেগে থাকতেন তিনি। যদি কেউ তাঁর সমালোচনা করত, তা হলে তাকে মারধর না



করতে পারলে তাঁর মেজাজ ঠান্ডা হত না! তখনকার দিনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাতশোরও বেশি নক্ষত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য যোহান্‌স কেপ্‌লার তাঁর হাতে যে কতবার চড়-থাপ্পড় খেয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। একবার টাইকো ব্রাহের একটি মন্তব্যে তাঁর এক প্রতিবেশী বিদ্রুপ করে হেসেছিলেন। ব্যস, ব্রাহে তাঁকে মারলেন এক ঘুসি! প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। শেষে ব্রাহে তরোয়াল নিয়ে এসে তাঁকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করলেন। শুরু হল ধুন্ধুমার লড়াই। শেষে প্রতিবেশীর তরোয়ালের এক কোপে ব্রাহের নাক কাটা গেল। সেই নাক আর জোড়া দেওয়া গেল না। তার বদলে একটা ধাতব নাক জুড়ে তিনি বাকি জীবনটা কাটালেন। তবু তাঁর শিক্ষা হয়নি। বৃদ্ধ বয়সেও বহুবার প্রকাশ্যে মারামারি করেছেন।

নরখাদকের যুক্তি

আজ থেকে দু'শো বছর আগেও মানুষের মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, ফিজি,



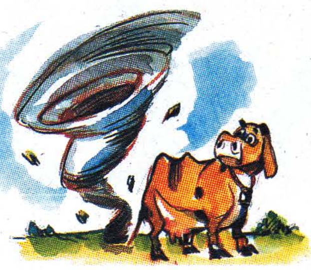
নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সুমাত্রার বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে! ফিজির উপজাতিরা বিশ্বাস করত যে, মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। তাই মানুষের মাংস খেলে শরীর ও মনের শক্তি বেড়ে যাবে ভীষণভাবে। আর তাই নিউগিনির একটি গোষ্ঠী খেত মানুষের হৃৎপিণ্ড আর মাথার ঘিলু। কারণ এই দুটোই নাকি মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মধ্য আফ্রিকার দুটো উপজাতির মধ্যে যখন যুদ্ধ শেষ হত, তখন বিজয়ীরা প্রতিহিংসা মেটাতে পরাজিতদের



খেয়ে ফেলত। উত্তর আমেরিকার একদল প্রজাতি পরিবারের কর্তার মৃত্যুতে সম্মান জানাতে তাঁর মৃতদেহ খেয়ে নিত। সুমাত্রার এক মানবগোষ্ঠীর ধারণা ছিল, মানুষ মরে গেলে ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে, কিন্তু তার মৃতদেহ খেয়ে নিলে ভোজনকারীর আত্মা পুষ্টিলাভ করবে।

ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়

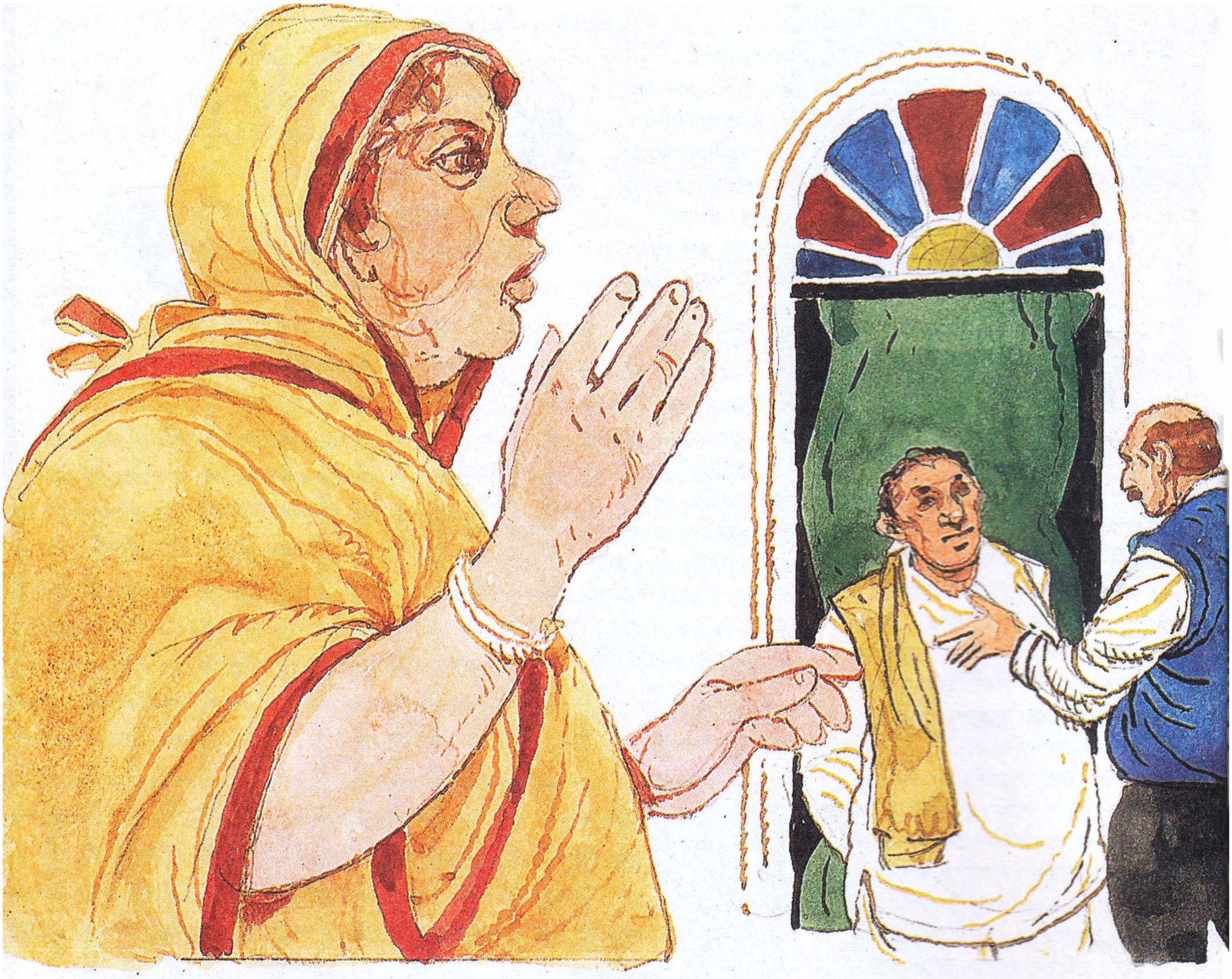
'টুইস্টার' ঘূর্ণিঝড়ের কথা যদি শুনি তা হলে নির্ঘাত ভিরমি খেয়ে পড়ব আমরা। টুইস্টারের



ঘোরার বেগ ঘণ্টায় ৪৮০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। কখনও-কখনও এই ঝড়কে ঘণ্টায় ৮০০ কিলোমিটার বেগেও ঘুরতে দেখা গেছে। ১৯২৫ সালের ১৮ মার্চ আমেরিকার মুসৌরিতে এই ঝড় কয়েক মিনিটের মধ্যে ৬৮৯ জন লোককে হাউইয়ের মতো শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে দফারফা করে দিয়েছিল। এই ঝড়ে ৮৫ জন ছাত্রছাত্রীসমেত একটা কাঠের স্কুলবাড়ি উড়ে গিয়ে পড়েছিল ১৩৪ মিটার দূরে। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির ৭০ টনের পাঁচটা বগি ছিটকে গিয়ে পড়েছিল ২৪ মিটার দূরে। অবশ্য এই ঝড়ের ঘোরার গতি ভয়ংকর হলেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার বেগ এমন কিছু নয়, প্রতি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার।

চঞ্চল পাল

ছবি: কৌশিক কুণ্ডু



"আচ্ছা বলো তো, আমার ডটপেনটা কোথায় রাখলাম? 'আনন্দমেলা'র শব্দসন্ধান করছিলাম, ফোন ধরতে ওঠার পর ফিরে এসে দেখি পেনটা গন।"

ধীরেনবাবুর প্রশ্নে স্ত্রী রাধারানি কিচেন থেকে উত্তর দিলেন, "টেলিফোনের পাশে খোঁজ করো, পেনটা পেয়ে যাবে।"

এই এক বিপদ হয়েছে ধীরেনবাবুর। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর মাঝে-মাঝেই অনেক কিছুর বিস্মরণ ঘটছে। গজগজ করতে-করতে রাধারানিদেবী এসে ঘরে ঢুকে বললেন, "এই তো তোমার পেন, ফোনের পাশে পড়ে আছে। দিন-দিন তোমার কী হচ্ছে বলো তো! অবিশ্যি চিরকালই তুমি ভুলো মনের লোক। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পর থেকে তোমার রোগ বাড়তে-বাড়তে এখন এই ষাট পার হয়ে একেবারে সাংঘাতিক অবস্থায় পৌঁছেছে। সবকিছু হারিয়ে ফেলছ, লোকের নাম ভুলে যাচ্ছ। সুনীলবাবুকে সেদিন তুমি হীরেন বলে ডেকে উঠলে। হয় তুমি সাইকিয়াটিস্ট কনসাল্ট করো নয়তো এবার আমি তোমার ওই ভুলের জ্বালায় মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি চলে যাব। কী করে যে তুমি এম. কম. পাশ করেছিলে, আর এতদিন ধরে কী করে যে সরকারি অডিট অফিসে চাকরি করলে, সেটা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

"গতকাল তুমি যা করলে সেটা একটা কাণ্ড বটে। আমরা টেপে গান শুনব বলে তুমি সুচিত্রা মিত্র আর দেবব্রত বিশ্বাসের দুটো ক্যাসেট নীলিমাদের বাড়ি থেকে জোগাড় করলে, পথে নারায়ণী মেডিক্যাল থেকে তোমার হজমের ওষুধ কিনতে গিয়ে ক্যাসেট দুটো দোকানের সেলস কাউন্টারে ফেলে রেখে শুধু ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে এলে! ভাগ্যিস আন্দাজে আমি এক ঘন্টার মধ্যে নারায়ণীতে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে ওদের শিবু বলল, 'হ্যাঁ, ক্যাসেট দুটো তুলে রাখা আছে।' এখন যদি অন্য খদ্দের ওদুটো নিয়ে চলে যেত তা হলে কী ঝামেলায় পড়তে হত বলো দেখি!"

ধীরেনবাবুর এই ভুলো মনের ব্যাপারটা 'বল্ডউইন কো-অপ হাউজ়িং কমপ্লেক্স'-এর প্রায় সকল বাসিন্দাই জেনে গেছেন। কসবায় এই হাউজ়িং সোসাইটির ফাউন্ডার মেম্বারদের প্রত্যেকের মাথায় টাক থাকায় এই নাম। হাউজ়িং কমপ্লেক্সে মোট আটটি হুবহু একরকম দেখতে চারতলা বাড়ি,

ভুলে যাওয়া

সিদ্ধার্থ ঘোষ



অর্থাৎ 'এ' থেকে 'এইচ' ব্লক আছে। প্রতি তলায় দুটি করে ফ্ল্যাট, পরিবেশ শান্ত আর নির্জন। চারপাশের জমিতে কনকচাঁপা, কদম, ছাতিম, নিম প্রভৃতি গাছের সঙ্গে টগর, শিউলি, জবা প্রভৃতি ফুলের গাছও আছে। রিটায়ারমেন্টের কিছু আগে এল আই সি থেকে লোন এবং নিজের জমানো টাকায় 'এইচ' ব্লকের দোতলায় দু'কামরার সাউথ ফেসিং সুন্দর ফ্ল্যাটটি কিনে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন ঝাড়া হাত-পা ধীরেনবাবু বসবাস করছেন। তাঁর কিন্তু শৈশব থেকে কৈশোর বয়সের অনেক কথাই মনে আছে। স্কুলে পড়ার সময় ক্লাসের সতীর্থ বাল্যবন্ধুদের নাম, তাদের চেহারা, এমনকী, অনেক খুঁটিনাটি ঘটনাও চেষ্টা করলে দিব্যি মনে করতে পারেন। নির্জন দুপুরে চোখ বন্ধ করে ভাবতে শুরু করলে সিনেমার ছবির মতো সব পরপর সামনে ভেসে ওঠে। ভবানীপুরের সেই বিখ্যাত ভবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম, হেডস্যার, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজির স্যার মিহিরবাবু, অঙ্ক ও ইতিহাসের শিক্ষক, সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ প্রমুখ সবাইকে। তাঁর বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে ছিল অজিত, দিলীপ, মনোজ, পঞ্চানন ওরফে পাঁচু, আর কালীচরণ ওরফে কালী।

কালী আর পাঁচুর মধ্যে একবার ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। ইংরেজির স্যার মিহিরবাবু মুখে-মুখে ট্রান্সলেশন ধরতেন। আগের দিন আলোচনা করে পরের দিন পড়া ধরতেন। ক্লাসের ৪০ জন ছাত্রের প্রত্যেককে এক-একটি বাক্যের বাংলা থেকে ইংরেজির অনুবাদ করতে হত। পড়া না পারলে ছাত্রদের ভাগ্যে জুটত বিকট ধমক আর তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে নির্মম কানমলা আর প্রচণ্ড চড়চাপড়। মিহিরবাবু ছিলেন ছাত্রদের কাছে, একেবারে যাকে বলে স্টোনম্যান।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় একদিন মিহিরবাবু কালীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এবার ঠেলাটা বোঝো-র ইংরেজি অনুবাদ কী হবে? কালী উঠে দাঁড়াল এবং আগের দিনের বলে দেওয়া উত্তর ভুলে গেল। পাশে পাঁচু বসেছিল। কালী স্যারের দিকে তাকিয়ে পাঁচুর গায়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে-মারতে ফিসফিস করে, "কী উত্তর হবে রে, কী উত্তর হবে রে," করতে লাগল। পাঁচু চুপ করে রইল। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এবার স্যার প্রহার এবং সেইসঙ্গে চণ্ডীপাঠ শুরু করবেন। এমন সময় দুষ্টবুদ্ধি-পাঁচু ফিসফিস করে কী একটা বলল। আতঙ্কগ্রস্ত কালীর মাথা তখন আর কাজ করছে না। পাঁচুর উত্তরটা শুনেই

ক্লাসের মধ্যে কালী চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'নাউ ইউ পুশ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ড'। শুনেই মিহিরবাবু চেয়ার থেকে উঠে কালীর দিকে এগোতে-এগোতে চেঁচাতে লাগলেন, "ওরে মর্কট, আমার সঙ্গে ধাষ্টামো, এবার ঠেলাটা তুই বোঝ, গত দিন ক্লাসে কি তোদের আমি বলে দিইনি যে, 'ফেস দ্য মিউজ়িক' কোথায় অ্যাপ্লাই হয়?" বলেই দু'হাতে কালীর দুটো কান আচ্ছা করে দলাইমলাই শুরু করে দিলেন। ক্লাস শেষ হওয়ার পর কালী পাঁচুর উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতি কষ্টে ধীরেন, অজিত, দিলীপ, মনোজ, দু'জনকে মারামারি থেকে সরিয়ে দিল, কিন্তু বহুদিন কালী আর পাঁচুর মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ ছিল।

এই ঘটনার ঠিক পরেই ধীরেন বাড়িতে বসে কৃতান্তকুমার রায়ের লেখা বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'উগান্ডার গুন্ডারা' পড়ছিল। বইটা ধীরেন পাঁচুর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। বইটার প্রথম পাতায় লেখা, 'জন্মদিনে পাঁচুকে স্নেহের উপহার—জেঠুমণি'। মারাত্মক রোমহর্ষক সব ঘটনার বর্ণনা আছে বইটায়। বাঘ, সিংহ, গোরিলা, কুমির এমনকী, নরমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়েও চারজন বাঙালি তরুণ কীভাবে হতোদ্যম না হয়ে অসংখ্য শত্রুনিধন করতে-করতে কিলিমাঞ্জারো পর্বতে গিয়ে হাজির হয়ে অবশেষে দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু ও তার দলবলের মোকাবিলা করল তারই রোমাঞ্চকর রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। বইটা ধীরেনের বারতিনেক পড়া হয়ে গেছে। চতুর্থবারের মতো পড়া চলছিল রবিবার সকালে, এমন সময় বন্ধুবর কালীচরণ এসে উপস্থিত। খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে জলখাবার খেয়ে কালি বলল, "কী বই পড়ছিস রে, আমাকে একবার পড়তে দিবি? পড়েই ফেরত দেব।"

ধীরেন বলল, "এটা একটা দারুণ বই, তুই পড়েই আমাকে ফেরত দিবি।"

কালীচরণ বই নিয়ে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু তিন-চারদিন পর ধীরেন বই ফেরত চাওয়ায় কালী জানাল, বইটা তার মাসতুতো ভাই তাকে না জানিয়ে জামশেদপুরে নিয়ে চলে গেছে। এখন পাওয়া যাবে না। পরে সে কলকাতায় ফিরলে ফেরত দেবে। এই কথার মধ্যে কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে, ধীরেন বুঝে উঠতে পারল না। এদিকে পাঁচু জোর তাগাদা শুরু করে দিয়েছে তার বই ফেরত পাওয়ার জন্য। শেষে তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত ধীরেন পাঁচুকে সব কিছু খুলে বলল, আর সব শুনে পাঁচু বলল, "তা হলে ওই বই ফেরত পাওয়ার আর কোনও চান্স নেই। কালী সেদিন ক্লাসে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার বইটা মেরে দিল।"

শেষমেশ ধীরেন কালীকে বলল, "ওটা পাঁচুর বই, তুই যেভাবে পারিস এনে দে। না হলে পাঁচুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে।"

শুনে কালী বলল, "ঠিক আছে, পাঁচুকে বল একদিন আমার বাড়িতে এসে বইটা ফেরত চাক, তারপর দেখি আমি কী করতে পারি।"

কিন্তু পাঁচুও আর কোনওদিন কালীর বাড়ি যায়নি, বইও ফেরত চায়নি। ধীরেন অবশ্য বাজার থেকে বইটা কিনে দিতে পারত। কিন্তু দুটো টাকাও ১৯৫২ সালে ছোটদের কাছে বেশ দুর্মূল্য ছিল। চোখ বুজে এখনও বইটা দেখতে পান ধীরেনবাবু, ময়লা লাগার ভয়ে পাঁচু বইয়ের মলাট খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। ১৯৫২ সালের কোনও একদিনের দৈনিক আনন্দবাজারের প্রথম পাতা দিয়ে মোড়া ছিল সেটা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এত কিছু ভুলে যাওয়া সত্ত্বেও শৈশব ও কৈশোরের বহু ঘটনা এখনও তাঁর অনুপুঙ্খ মনে আছে। অথচ এ-জিনিসটা তাঁর স্ত্রী থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউই বিশ্বাস করতে চায় না। সকলেই তাঁর সাম্প্রতিক ভুলো মনের ঘটনাগুলোকে বড় করে দ্যাখে। আর ধীরেনবাবুও মাস তিন-চারেকের মধ্যে যে দুটো বড় ধরনের কেলেঙ্কারি করেছেন তার জন্য চেনা-পরিচিত সকলেই আড্ডা-জমায়েতে সেই ঘটনাবলির সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দেয়।

প্রথম ঘটনাটা হল, কিছুদিন আগে সকাল সাড়ে দশটায় পুরনো বাল্যবন্ধু অজিতের বাড়িতে সময় কাটিয়ে তিনি বন্ডুইন হাউজ়িং-এ ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় চেঞ্জ করে লুঙ্গি পরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। ঘরে ঢোকার সময় অবশ্য তাঁর একবার মনে হয়েছিল ঘরের জিনিসপত্র একটু বেশি অন্যরকম। এমনকী, আলনায় রাখা লুঙ্গিটার রংও আলাদা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী নীলিমাদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ায় তিনি ভাবলেন যে, রাধারানিদেবী ফিরে এলে ঘরের এবং জামাকাপড়ের এইসব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করবেন। শরীর ক্লান্ত থাকায় একটু ঘুমঘুম এসে গিয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই 'জি' ব্লকের দোতলার ফ্ল্যাটের মালিক গিরিজাশঙ্করবাবু ও তাঁর স্ত্রীর গলার আওয়াজে তাঁর ঘুম ছুটে গেল। গিরিজাবাবু তাঁর শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করছেন, "কী ব্যাপার ধীরেনবাবু, আপনার শরীর খারাপ নাকি? নিশ্চয়ই খারাপ, তা না হলে আপনি আমার ফ্ল্যাটে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে জামাকাপড় চেঞ্জ করে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে শুয়ে আছেন যে! একটু শুয়ে থাকুন, এখনই ডাক্তার ডেকে আনছি। আসলে আমি ও আমার স্ত্রী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেসলুম, দরজাটা খোলাই ছিল, এখন ফিরে এসে দেখছি আপনার এই অবস্থা!"

বিশাল এক হাত জিভ কেটে বিছানা থেকে উঠতে-উঠতে ধীরেনবাবু বলতে লাগলেন, "এঃ, ছি ছি, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি দেখছি 'এইচ' ব্লকে না ঢুকে 'জি' ব্লকে এসে পড়েছি। সবই তো একরকম দেখতে। তা ছাড়া আপনার ও আমার ফ্ল্যাট দুটোই দোতলায় একই পজিশনে, ফলে একেবারে গুলিয়ে গেছে। আমাকে আপনারা মাপ করে দিন।"

দ্বিতীয় ঘটনাটা হল, ধীরেনবাবু তাঁর মাসতুতো ভাই অচিনের ছেলে ভোম্বলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে যে কেলোটা করেছিলেন। উত্তর কলকাতার কাশীপুরে 'আনন্দনিকেতন' বিয়েবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বিয়েবাড়িটা চার নম্বর বাস টার্মিনাসের ঠিক উলটো দিকে। সদ্য পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সেন্ট মেখে হাতে উপহারের প্যাকেট নিয়ে ধীরেনবাবু ট্যাক্সি থেকে কাশীপুরে চার নম্বর বাস টার্মিনাসের সামনে নেমে ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সামনের দিকে তাকালেন।

তিনি একাই এসেছেন, কারণ, স্ত্রী রাধারানিদেবী তাঁর পুরনো এক বান্ধবীর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ একই দিনে পড়ায় সেখানে চলে গেছেন। ধীরেনবাবু তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই একটা দোতলা বিয়েবাড়ি। সানাইয়ের আওয়াজ আসছে। চারদিক আলোকমালায় ঝলমল করছে। বাড়ির সামনে অনেক গাড়ি আর সেজেগুজে লোকজন ভিড় করে আছে। সুতরাং ধীরেনবাবু প্যাকেট হাতে সেদিকে দ্রুতবেগে ধাবমান হলেন। গেটের কাছে একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করতেই তিনি সসম্মানে জানালেন, "হ্যাঁ, ঠিকই, এটাই আনন্দনিকেতন বিয়েবাড়ি।"

শোনামাত্র ধীরেনবাবু "ভোম্বল কোথায় রে? ভোম্বল কোথায় রে?" বলতে-বলতে ভিতরে ঢুকে লক্ষ করলেন, সবাই তাঁর সম্ভ্রমজাগানো চেহারা ও সাজপোশাক দেখে বিশাল খাতির ও সমাদর শুরু করে দিয়েছে। একটি কমবয়সি ছেলে তাঁর গায়ে গোলাপজল স্প্রে করে দিয়ে বলল, "দাদু এখন ভোম্বলদাকে খুঁজে বের করা মহামুশকিল। আপনি খাবার জায়গায় চলে যান, ওখানেই ভোম্বলদাকে পেয়ে যাবেন।"

পাতপেড়ে খাওয়া এবং বুফে—দু'রকম ব্যবস্থাই ভোম্বলরা করেছিল। ব্যাচ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে ধীরেনবাবু বুফের দিকেই এগোলেন। অলরেডি সেখানে নিমন্ত্রিতদের একটা লাইন পড়ে গেছে। সারি-সারি বার্নারের উপর স্টেনলেস স্টিলের বউলে বিরিয়ানি, চিকেন মশালা, মটন কষা, ফিশ ফ্রাই-এর প্রাণকাড়া গন্ধে জায়গাটা একেবারে ম-ম করছে। সুড়ুত করে জিভের জলটা সামলে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার প্লেট, কাঁটা-চামচ, স্পুন, পেপার, ন্যাপকিন হাতে নিয়ে লাইন ধরে এগোতে-এগোতে ভাবলেন মোটা-মোটা রাধাবল্লভী, আলুর দম প্রভৃতি আজেবাজে জিনিস না খেয়ে শুধুমাত্র পছন্দসই সেরা জিনিসগুলোই খাবেন। প্লেটে খাবার সাজিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে অপূর্ব সুখাদ্য খেতে-খেতে অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। যেমন ওর মাসতুতো দাদা গুপিদা, চারুমামা, বৃদ্ধ মেসোমশাই সুধীরবাবু এবং আরও অনেকে। খেতে-খেতে গল্পগুজব চলতে লাগল। এর মধ্যে খুঁজে-খুঁজে ভোম্বল এসে হাজির। এসেই বলল, "চলো ধীরেনদা, নতুন বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ফাঁকতালে উপহার গছিয়ে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কেটে পড়বেন, সেটি হচ্ছে না।"

ফলে খাওয়া শেষ হওয়ার পর ভোম্বল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বউয়ের থ্রোনের কাছে চলে এল। ঘরে ঢোকার সময় দোকান থেকে সদ্য কেনা ঝকঝকে নতুন স্যান্ডেলজোড়া খুলে রেখে বিভিন্ন বয়সি মহিলা পরিবৃতা নববধূর কাছে গিয়ে উপহারের বইয়ের প্যাকেট সত্যজিৎ রায়ের গল্প ১০১ গিফ্‌ট করলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে ভোম্বলকে বললেন, "তোর বউ তো দারুণ হয়েছে রে। এ তো দেখছি বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।"

রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী কিছুক্ষণ আগেই চলে এসেছেন। সুতরাং ধীরেনবাবু নিশ্চিন্ত মনে বেশবাস পরিবর্তন করে মুখ, হাত-পা ধুয়ে ঘুমোতে চলে গেলেন। বোমাটা ফাটল পরের দিন সকালে স্ত্রী রাধারানিদেবীর চিৎকারে, "তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ?"

সদ্য ঘুমভাঙা চোখে হকচকিয়ে ধীরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হলটা কী? আমি আবার কী করলাম?"

"কী না করেছ তুমি! গতকাল বিয়েবাড়ি থেকে কার একপাটি স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে চলে এসেছ?"

"তার মানে?"

"একবার নিজের চোখে জুতো রাখার র‍্যাকে গিয়ে দেখে এসো না।"

অগত্যা ধীরেনবাবু সদ্য ঘুমভাঙা চোখে যা দেখলেন তা হল একজোড়া স্যান্ডেল, ডান পায়েরটা ঝকঝকে নতুন, আর বাঁ পায়েরটা ভাল কোম্পানির ঠিকই এবং একই মাপেরও বটে, কিন্তু সেটা খুব পুরনো, রংচটা। দেখে মনে হচ্ছে দু'-একদিনের



মধ্যেই ওটার স্ট্র্যাপ-ফ্যাপ সব ছিঁড়ে যাবে।

রাধারানিদেবী বললেন, "নাক ডাকিয়ে তো বেলা সাড়ে আটটা অবধি ঘুমোচ্ছ, ওদিকে একটু আগে তোমার মাসতুতো দাদা গুপিদার স্ত্রী ললিতা ফোন করে জানাল, "ওঁর স্বামী অদ্ভুত একজোড়া স্যান্ডেল পরে ভোম্বলদের বিয়েবাড়ি থেকে গতকাল ফিরেছেন। অনেক খুঁজেও গুপিদা ওঁর স্যান্ডেলের একপাটি খুঁজে পাননি। অথচ অন্য কারও একই মাপের বাঁ পায়ের নতুন একপাটি স্যান্ডেল পড়ে আছে। গুপিদা আর কী করেন, খালি পায়ে তো আর হাঁটা যায় না, ফলে ওই অদ্ভুত কম্বিনেশনের একজোড়া জুতো পায়ে দিয়েই বাড়ি ফিরেছেন।"

"এ হে হে হে, তা হলে গন্ডগোল আমিই করেছি।" ধীরেনবাবুর অকপট স্বীকারোক্তি।

"তা ছাড়া আবার কী। ফোনটা রাখার পর আমার সন্দেহ



ভুলে যাওয়া

হল, জুতোর র‍্যাকের কাছে গিয়ে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই,” রাধারানিদেবী আক্ষেপের সুরে বললেন, “হ্যাঁ গো, তোমার পায়ে কি পক্ষাঘাত হয়েছে, কোনও সাড় নেই বুঝি! ছি ছি ছি, কী কেলেঙ্কারি। এখন যাও, ওই একপাটি জুতো নিয়ে গুপিদার বাড়ি গিয়ে বদলাবদলি করে নিয়ে এসো।”

এসব দেখেশুনে ধীরেনবাবুর নিজের উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব তিনি এবার অনুভব করছেন।

এই শেষ বয়সের দিকে তিনি খুব কষ্ট করে খোঁজখবর নিয়ে ভবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরনো ক্লাসফ্রেন্ডদের বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর জোগাড় করেছেন। অজিত আর দিলীপ তাঁর মতো কলকাতাতেই বরাবর চাকরি করে এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁরা দু’জনেই সল্টলেকের দিকে নতুন বাড়ি করে সেখানে থাকেন। কিন্তু মনোজ, পাঁচু ও কালী চাকরিসূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থাৎ দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে চাকুরিজীবন কাটিয়ে অবসরগ্রহণের পর অতি সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। মনোজ গল্‌ফগ্রিনে একটা নতুন ঝকঝকে ফ্ল্যাট কিনেছেন কিন্তু পাঁচু ও কালী যথাক্রমে হরিশ মুখার্জি রোড ও মনোহরপুকুর রোডে তাঁদের সাবেকি পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এসেছেন। সকলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে একদিন রবিবার সকালে ধীরেনবাবু ওঁদের নিজের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন।

রবিবার পাঁচ বন্ধু এক-এক করে সকালের দিকে ধীরেনবাবুর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন। মনোজ, কালী, পাঁচু, অজিত, দিলীপদের সঙ্গে ধীরেনবাবু অনেকক্ষণ জমিয়ে আড্ডা মারলেন। প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর। কারও মাথা কেশবিরল, কারও মাথায় পলিতকেশ। কিন্তু একটু ভাল করে মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে ফেলে আসা শৈশবের দুষ্টুবুদ্ধিভরা চোখ, ঠোঁটের হাসি এখনও চেনা যায়। আড্ডার মাঝে শিঙাড়া, ইলিশের ডিমভাজা, রসগোল্লা, চা, বিস্কুট রাধারানি ধীরেনবাবুর বাল্যবন্ধুদের পরিবেশন করে গেলেন। পুরনো স্কুল, খেলার মাঠ, স্যারদের কথার স্মৃতিচারণ করে বেলা বারোটা নাগাদ সকলে গাত্রোত্থান করলেন। আসর ভাঙার সময় ঠিক হল, এবার থেকে প্রতি রবিবার সকালে কোনও-না-কোনও বন্ধুর বাড়িতে আবার সকলে মিলিত হবেন। দেখা গেল, কালী ও পাঁচুর মধ্যে আর কোনও মনোমালিন্য নেই। বোধ হয় ছেলেবেলার তুচ্ছ ঘটনা ভুলে গেছেন। ধীরেনবাবুও আর ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তুললেন না। কালী শুধু যাওয়ার আগে ধীরেনবাবুকে বললেন, “ধীরু, পারিস তো এর মাঝে একদিন আমার মনোহরপুকুরের বাড়িতে ফোন করে সকালের দিকে চলে আয় না, তুই তো স্কুলে পড়ার সময় আমাদের বাড়িতে বহুবার এসেছিস। তোর তো সবই চেনা।”

ধীরেনবাবু দু’দিন বাদে অর্থাৎ বুধবার সকালে কালীর মনোহরপুকুর রোডের বাড়িতে আড্ডা মারতে গেলেন। ডোরবেল বাজাতে কালী নিজে দরজা খুলে ধীরেনবাবুকে ভিতরে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আগে, এ-ঘরে কালীর বাবা করালীচরণবাবু বসতেন। ঘরটা বেশ বড়। এখন কালীই হচ্ছেন এ-বাড়ির সর্বময় কর্তা। ঘরের ডান দিকে প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বইয়ের র‍্যাক, বাঁ দিকে টেবিল, চেয়ার, টিপয় প্রভৃতি রাখা আছে। গল্প করতে-করতে ধীরেনবাবু বললেন, “দ্যাখ কালী, ছেলেবেলার বন্ধুরাই আসল প্রাণের বন্ধু। চাকরিজীবনে প্রকৃত বন্ধুত্ব আর হয় না। কেননা, তখন শুধুই ধান্দাবাজি, ইঁদুর দৌড়, এসব শুরু হয়ে যায়। এই জন্য আমি বুড়ো বয়সে সব সময় শৈশবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। আর ছোটদের গল্পের বই আবার নতুন করে পড়তে শুরু করেছি, বেশ ভাল লাগছে।”

কালী বললেন, “আমি অবশ্যি সব রকমের বই-ই পড়ি, ছোটদের বা বড়দের কিছুই বাদ দিই না। এই নানা বিষয়ের বই পড়েই তো এখন আমার সময় কাটে। ঘরের ওদিকের র‍্যাকে আমার বইয়ের কালেকশন, তুই ইচ্ছে করলে দেখতে পারিস।” এর মধ্যে চা-বিস্কুট নিয়ে কাজের লোক ঘরে ঢুকল। চা খেয়ে ধীরেনবাবু বইয়ের র‍্যাকের দিকে এগোলেন, আর কালী সকালের আনন্দবাজারটা আবার পড়তে শুরু করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলির পর একধারে বাঁধানো, ‘আনন্দমেলা’, ‘শিশুসাথী’, ‘রংমশাল’, ‘মৌচাক’ প্রভৃতি সাজানো আছে। বেশ কিছু পূজাবার্ষিকীও রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ধীরেনবাবুর হঠাৎ চোখে পড়ল বহুদিনের পুরনো আনন্দবাজারে মোড়া একখানি বই। বইটার শুধু স্পাইনটা দেখা যাচ্ছে। ওইটুকু অংশই ধীরেনবাবুর স্মৃতিকোঠার একটা দরজা যেন ধাক্কা মেরে খুলে দিল। ধীরেনবাবু কালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “দু’-একটা ছোটদের বই পড়ার জন্য ধার নিতে পারি কি?”

খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে কালী বললেন, “স্বচ্ছন্দে। যে বই পছন্দ নিয়ে যা না।”

দুটো বাঁধানো রংমশাল আর মৌচাকের ফাঁকে আনন্দবাজারে মোড়া ছোট্ট বইটাও নিঃশব্দে ধীরেনবাবুর কাঁধে ঝোলানো সাইডব্যাগে চলে এল। অপটু হাতের হাতসাফাই কালী দেখতেই পেলেন না। কালীকে ধীরেনবাবু বললেন, “একটা বাঁধানো মৌচাক আর রংমশাল নিয়ে যাচ্ছি, পড়ে এক হপ্তার মধ্যেই ফেরত দিয়ে যাব।”

এর পর সোজা হরিশ মুখার্জি রোডে পাঁচুর বাড়িতে এসে ধীরেনবাবু কলিংবেল বাজালেন। পাঁচু বাড়িতেই ছিলেন। হঠাৎ ছেলেবেলার বন্ধু ধীরেনকে দেখে হাসিমুখে বললেন, “আয়, আয়, এই অবেলায় কী মনে করে?”

কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরে ঢুকে ধীরেনবাবু চেয়ারে বসে সাইডব্যাগ থেকে আনন্দবাজারে মোড়া বইটা পাঁচুর হাতে তুলে দিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আসল মালিকের হাতে হারানো বই পৌঁছে গেল। পাঁচু অবাক হয়ে ধীরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বইটা খুললেন। হাসিতে পাঁচুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবার সব মনে পড়ে গেছে, কারণ, বইয়ের একেবারে গোড়ার দিকে প্রথম পাতায় লেখা আছে, ‘জন্মদিনে পাঁচুকে স্নেহের উপহার—জেঠুমণি’।

ছবি: অনুপ রায়



ক্যাম্পাস

ফেস্ট, নতুন কোর্স, অনুষ্ঠান, এক্সকারশন, খেলাধুলো সবই থাকবে এই পাতায়।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

নরেন্দ্রপুর

পড়াশোনার বাইরে কী কী হচ্ছে তোমাদের স্কুলে

ছোটদের আনন্দমেলার এই বিভাগে কলকাতা ও অন্যান্য জেলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাতে পারো স্কুলের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বিষয়ক নানা খবর। একটি স্কুল থেকে অন্তত চারটি খবর আমাদের হাতে আসা চাই। সঙ্গে থাকা চাই রঙিন ফোটো। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'আনন্দমেলা ক্যাম্পাস বিভাগ' কথাটি।

আমাদের বিদ্যালয়

ফুলে-ফলে ঘেরা আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মা সারদা আর স্বামীজির আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজ ১৯৪৩ সালের ৭মে পূণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এই আশ্রম স্থাপন করেন। আজও আমরা সেই আদর্শকেই পাথেয় করে জীবন গঠনের পথে এগিয়ে চলেছি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আমাদের বিদ্যালয়টি আবাসিক। এখানে সারা বছর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে পালিত হয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। এ ছাড়া রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠান তো আছেই। শিশু সাহিত্য সম্মেলন ও কবি সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। আশ্রমের উদ্যোগে, ছাত্র ও শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মঞ্চস্থ হয় নাটক ও যাত্রাপালা।



শিক্ষামূলক ভ্রমণ

প্রতি বছর বিদ্যালয় থেকে আমাদের নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। জানুয়ারি মাসে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় শিক্ষামূলক ভ্রমণে। শীতের মনোরম দিনগুলোয় এই ভ্রমণ সত্যিই খুব আনন্দের।

বার্ষিক প্রদর্শনী

আমাদের স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনীই হল আমাদের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আমাদের এই প্রদর্শনী। চারদিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আকর্ষক বিষয়গুলো হল, 'যেমন খুশি সাজো', 'স্কাউট', 'রিপ্লে' ইত্যাদি। সঙ্গে থাকে পুরস্কার বিতরণী



অনুষ্ঠান। অগণন লোক সমাগমের মধ্য দিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে বিচিত্র বিষয় নিয়ে আমাদের প্রদর্শনীও।

অরিন্দম নস্কর
অঙ্কনশুভ্র কুণ্ডু
স্বর্ণাভ বিষ্ণু
অর্পণ দত্ত
এরা সবাই সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

ছোটমামার ম্যাজিক

তন্ময় রায়চৌধুরী



আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক অঞ্চলে। সেই সময় জায়গাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা ছিল। বেশ বড়-বড় দু'খানা মাঠ ছিল, কাছাকাছি এলাকায়। মনে পড়ে, গরমের ছুটি পড়লেই আমি আর আমার পাড়ার বন্ধুরা সকালবেলা আর বিকেলবেলা মাঠে ছুটতাম, ক্রিকেট আর ফুটবল খেলার জন্য। এখানে কলকাতায় গরমের ছুটি মাত্র এক মাসের। কিন্তু দিল্লিতে গরম এত বেশি পড়ত যে, আমাদের পাক্কা দু' মাস স্কুল ছুটি থাকত। আর সঙ্গে থাকত বিশাল হোমওয়ার্কের বোঝা, ছুটির পড়া। কিন্তু ওই দু' মাসের ছুটির পুরোটাই যে দিল্লিতে কাটাতাম তা কিন্তু নয়। প্রায় প্রত্যেক বছরই বেড়াতে চলে আসতাম কলকাতায়। বলা ভাল, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে আমরা পালিয়ে আসতাম এক মাসের জন্য।

তো, এইরকম একটা গরমের ছুটিতে, কলকাতায় মামার বাড়িতে এসে উঠেছি। একদিন সকালবেলা মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে ঘরে বসে ক্যারম খেলছি, এমন সময় বড়মামা এসে বললেন, "কী রে, এই গরমের মধ্যে একদিন নদীর ধারে পিকনিক করতে যাবি নাকি?"

আমরা তো খেলা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। নদীর ধারে পিকনিক। দিল্লিতে যমুনার পাশে পিকনিক করার জায়গাই নেই। তাই ব্যাপারটা কীরকম হতে পারে, তা জানতামই না। মুন্টিদি আর রিঙ্কুদাও দেখলাম লাফাতে শুরু করে দিয়েছে। আর বুবলি, আমার বোন, কিছু না বুঝেই আমাদের সঙ্গে চেঁচাতে শুরু করেছে, "নদীর ধারে পিকনিক! নদীর ধারে পিকনিক!"

ছোটমামা আমাদের সঙ্গে ক্যারম খেলছিলেন। তিনি বেশ গম্ভীর মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু দাদা, যাবি কোথায়, সেটা আগে বল?"

বড়মামা বললেন, "কোলাঘাট। আমার কলেজের বন্ধু সুশান্তর বাড়ি ওখানে। কাল বিকেলে ওর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ও তো দারুণ খুশি। আর তোরা স্বাভাবিকভাবেই রাজি হবি আন্দাজ করে আমি ওকে কথা দিয়েছি যে, আমরা পরশু ওখানে যাব। কী রে যাবি তো সক্কলে?"

শেষ প্রশ্নটা আমাদের করা, আর আমরা চার ভাইবোন তাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম, "নিশ্চয়ই। নদীর ধারে পিকনিক!"

সেই কথামতো দু' দিন পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কোলাঘাটের দিকে। আমরা মানে বিশাল একটা দল। আমি, বোন, বাবা-মা, বড়মামা, মামি, মুন্টিদি, রিঙ্কুদা, ছোটমামা আর সেইসঙ্গে সেদিন সকালেই এসে পৌঁছনো ছোটমাসির টিম। মাসি-মেসো, স্বাতী, টুবাই। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে, আমরা চেপে বসলাম একটা লোকাল ট্রেনে।

ট্রেন চলতে শুরু করতেই আমরা ছয় শয়তান ট্রেনের ছোট্ট কামরার মধ্যেই 'ধরাধরি খেলা' খেলতে শুরু করে দিলাম। সকালের দিক বলে ফাঁকা ছিল ট্রেনটা। ফলে আমরা পুরো কামরা জুড়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিলাম। মা, মামি আর মাসি যত আমাদের একজায়গায় বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, আমাদের ছটফটানি ততই বেড়ে যায়।

শেষে আমাদের চুপ করে বসানোর জন্য হঠাৎ ছোটমামাকে দেখলাম আমাদের ছোটাছুটির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর দু'টো হাত মুখের দু'দিকে এনে একটা চোঙার মতো করে ধরলেন। ছোটমামা নানারকম মজার-মজার গলা করতে পারতেন। কোনও সময়ে বুড়োর গলা, তো কখনও নাকি সুরে কথা। সেরকমই একটা মজাদার গলা করে ছোটমামা বলতে শুরু করলেন, "শুনুন! শুনুন! শুনুন! ছুটতে থাকা ছোটরা, বসে থাকা বড়রা! এক্ষুনি শুরু হবে জাদুকর টাকডুমাডুম ডুম-এর ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিক শো! যাঁরা দেখতে চান, যে-যার নিজের-নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। শো এক্ষুনি শুরু হবে।"

ছোটমামার মজাদার গলা আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমরা বুঝতে পারলাম, দারুণ কিছু একটা তিনি করতে চলেছেন। আমরা চটপট যে-যার সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। এদিকে কামরায় যে কয়েকজন লোক ছিলেন, তাঁরাও ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখছে কী ব্যাপার। কিন্তু ছোটমামা সেদিকে তাকালেন না।

"মাননীয় যাত্রী-বন্ধুরা," তিনি বলে চললেন, "আজ আপনাদের সামনে 'মিশর থেকে চিন ঘুরে আসা কুড়ি দিন' জাদুকর টাকডুমাডুম ডুমকে উপস্থিত করছি। সেই বিখ্যাত কয়েন অদৃশ্য, টিনখেকো, শূন্য থেকে লজেন্স আনা নিত্যযাত্রী জাদুকর টাকডুমাডুম ডুম। তো, বাজনা বাজাও হে, টাকডুম টাকডুম ডুম টাক।"

আমরা ছ'জন সব একদিকে দলবেঁধে বসেছিলাম। এবার ছোটমামা আমাদের দিকে পাশ ফিরে ওঁর বাঁ হাতটা আমাদের সামনে তুলে বললেন, "ছোট্ট বন্ধুরা, এবার দ্যাখো এই চিনা



ভোজবাজি। আমি আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কোনও রক্ত না বের করেই কেটে ফেলব। ভয় পাবে না কিন্তু একদম। এই দ্যাখো।"

এবার ছোটমামা ওঁর ডান হাতটা মুঠো করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটাকে চেপে ধরলেন। তারপর আস্তে-আস্তে ওঁর ফরসা মুখটা লাল হতে শুরু করল। ওঁর মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল খুব ব্যথা হচ্ছে, আর তারপরেই... হঠাৎ উনি ডান হাতের মুঠোটা টেনে সরিয়ে নিতেই আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ওঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটার জায়গায় কিচ্ছু নেই, একদম সমান জায়গাটা। আর ওঁর কাটা বুড়ো আঙুলটা বাঁ হাতের বাকি চার আঙুল আর ডান হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে মুখ বের করে আছে, আর মাঝে-মাঝে নড়ে উঠছে! একফোঁটা রক্ত বের হয়নি!

এই সময়ই বুবলি হঠাৎ ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। বেচারি এতক্ষণ হাঁ করে ম্যাজিক দেখছিল। কিন্তু ছোটমামার কাটা আঙুল লাফাচ্ছে দেখে ও ভয়ে কেঁদে ফেলল।

অমনি জাদুকর টাকডুমাডুম ডুম চেঁচিয়ে উঠল, "এ হে হে হে! ছোট্ট মেয়ে ভয় পেয়ে গেছে। কেঁদো না, কেঁদো না। কাটা আঙুল এক্ষুনি জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে ছোটমামা ওঁর ডান হাতটা মুঠো করে একবার বাঁ হাতে ঠেকালেন, আর ডান হাতের মুঠোয় একটা ফুঁ দিয়ে বিড়বিড় করে কীসব বললেন। তারপর ডান হাতের মুঠোটা বাঁ হাতের উপর একবার বুলোতেই... ছোটমামার কাটা আঙুলটার জায়গায় আর-একটা নতুন আঙুল। এমনকী, সেই ভোঁতা নখটাও রয়েছে, অবিকল একইরকম দেখতে।

"ব্যাপারটা ধরতে পারলি?" রিঙ্কুদা ফিসফিস করে আমায় বলল।

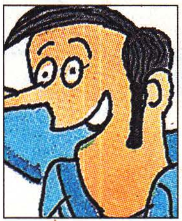
আমি আস্তে-আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়লাম, বুঝিনি।

"উনি বুড়ো আঙুলটাকে ভাঁজ করে হাতের তালুর পিছনে আড়াল করে রেখেছিলেন। তাই আমরা কেউ দেখতে পাচ্ছিলাম না, আর মনে হচ্ছিল উনি আঙুলটা কেটে ফেলেছেন," সেই একইরকম ফিসফিস করে আমায় ম্যাজিকের রহস্যটা জানাল রিঙ্কুদা। ও ছোটমামার অন্ধ ভক্ত। খেলাটা নিশ্চয়ই ছোটমামা ওকে আগেই দেখিয়েছেন।

ওদিকে জাদুকর টাকডুমাডুম ডুমের কাটা বুড়ো আঙুল ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছে দেখে সবাই খুব জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। আর টুবাই, বুবলি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আর-একটা ম্যাজিক। আর-একটা ম্যাজিক।"

ছোটমামা আবার সেই মজাদার গলায় বলতে শুরু করলেন, "আচ্ছা, সবাই অপেক্ষা করো। তোমাদের অনুরোধে আমি আর-একটা ম্যাজিক দেখাব। এবার আমি একটা কয়েন অদৃশ্য করে দেব। তারপরে সেটাকে বের করব তোমাদের কোনও একজনের কান থেকে। তো ওহে বাজনদার, বাজাও হে টাকডুম টাকডুম ডুম টাক।"

নিজের মানিব্যাগ থেকে ছোটমামা একটা এক টাকার কয়েন বের করে দু' আঙুলে তুলে সবাইকে দেখালেন। "এই এক টাকার কয়েনটাকে আমি কনুইতে ঘষে-ঘষে অদৃশ্য করে দেব, এই দ্যাখো...।" বলে ছোটমামা কয়েনটাকে ঘষতে শুরু করলেন কনুইতে, আর তার সঙ্গে একটানা যত রাজ্যের কিম্ভূতকিমাকার সব শব্দ বলে যেতে লাগলেন,



ছোটমামার ম্যাজিক

"ইয়াহুপিহুপিহাপ চিরিবামবাম চিরিবামবাম হাঃ তারারাত্তামতামতামতাতাম, এই কয়েন হাপিস হয়ে যা।"

জাদুকর টাকডুমাডুম ডুমের মুখে ওইসব বিটকেল শব্দ শুনে আমরা তো হাসতে-হাসতে একজন আর-একজনের ঘাড়ে গড়িয়ে পড়ছি। তার মধ্যেই ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখি হাতের কনুইয়ে যে কয়েনটা ঘষছিলেন সেটা আর কনুইয়ে নেই। আর দু'হাতের দশ আঙুল ছড়িয়ে সারেন্ডার করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছোটমামা মুচকি-মুচকি হাসছেন। কয়েনটা ওঁর হাতেও কোথাও নেই।

আমরা সবাই হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উনি একটা অদ্ভুত খোনা গলায় হাসতে শুরু করলেন। হিঁঃ হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ হাঁই। খোঁকাবাবুরা সঁব অঁবাক হঁয়ে গেঁছ দেঁখছি। এঁইবার দ্যাঁখো, কীঁ হঁয়!"

এই বলে উনি আস্তে-আস্তে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। তারপরে বুবলির সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কয়েকবার নেড়েচেড়ে, বিড়বিড় করে কীসব বলে বুবলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "বঁলো খুঁকি, কোঁন কাঁন দিঁয়ে কঁয়েনটা বেঁর কঁরব?"

"ডান কান দিয়ে। না না, টাকডুমাডুম ডুম, তুমি আমার বাঁ কান দিয়ে বের করো।" বুবলি বেশ গম্ভীরভাবে বলল।

"বঁহুত আঁচ্ছা।" বলে ছোটমামা বুবলির বাঁ কানের গোড়ায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে দু' আঙুলে টেনে বের করে আনলেন এক টাকার কয়েনটা।

আমরা সবাই আবার জোরে হাততালি দিয়ে উঠলাম। দারুণ ম্যাজিক।

"ধরতে পারলি?" রিঙ্কুদা আবার ফিসফিস করে বলল, "কথা বলতে-বলতে এক ফাঁকে কয়েনটা শার্টের হাতায় ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপরে ঠিক সময়ে হাতসাফাই করে বুবলির কান থেকে... বুঝলি?"

রিঙ্কুদা বোধ হয় আরও কিছু বলত, কিন্তু ঠিক সেই সময় ছোটমামার দিকে তাকিয়ে দেখি, উনি কীরকম একদৃষ্টিতে ছোটমাসির দিকে তাকিয়ে আছেন। ছোটমাসি বসেছিল একটা জানলার পাশে। গরমকালের সূর্য তখন সেই জানলায় রীতিমতো তেজের সঙ্গে আলো দিচ্ছে। আর ছোটমাসি সেই আলোটাকে আড়াল করতে একটা টুপি মাথায় দিয়ে ট্রেনের দুলুনিতে কোনও একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

ছোটমামাকে দেখলাম, বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে একবার আমাদের দিকে আর একবার মা-মামাদের দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বোঝালেন, "সব্বাই যেন চুপ করে থাকি। কোনও শব্দ নয়।"

তারপরে, ছোটমামা দেখলাম খুব সাবধানে ছোটমাসির সিটের পিছন দিকে চলে গেলেন। তারপর আস্তে-আস্তে হাত বাড়াতে লাগলেন ছোটমাসির মাথার টুপিটার দিকে। তারপরই হঠাৎ টান মেরে টুপিটা তুলে নিয়েই চটপট গুঁজে ফেললেন ওঁর শার্টের পিছনে।

এদিকে টুপি তুলতে গিয়ে টান পড়ায় ছোটমাসি জেগে উঠেছে। আর জেগে উঠেই ওর হাত গিয়েছে মাথায়। আর তারপরেই চিৎকার, "অ্যাঁ, টুপিটা? কোথায় গেল। জানলা দিয়ে উড়ে গেল নাকি?"

বড়মামা সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম অবস্থা সামাল দিয়ে দিলেন, "আরে ছাড় না, একটা টুপিই তো উড়ে গেছে শুধু, অন্য কিছু তো নয়?"

"তুই ওই কথাটা বলতে পারিস দাদা, কিন্তু আমি নয়।"

মাসি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "জানিস, ওটা আগ্রা থেকে কেনা। আমার খুব পছন্দের টুপি। আমি...।" বলেই মাসি হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি চেন টানব। এই তো কয়েক হাত দূরে পড়ে গেছে, ছুটে গেলেই পেয়ে যাব।"

বড়মামা অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন, "পাগল হলি নাকি? টুপির জন্য চেন টেনেছিস শুনলে পাবলিক কীরকম গালাগালি দেবে জানিস?"

ছোটমাসি চেন টানবেই আর বড়মামা চেন টানতে দেবেন না। কিছুতেই নয়।

ছোটমামা বোধ হয় আন্দাজ করেননি, এইরকম একটা ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। আমরা এদিকে চুপ করে বসে দেখছি উনি কী করেন।

তখনই উনি আবার দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আছি! আছি! আছি! জাদুকর টাকডুমাডুম ডুম থাকতে ভাবনা কী? এইবার দ্যাখো আমার নতুন ম্যাজিক চলন্ত লোকাল থেকে উড়ন্ত টুপিকে ফেরত আনা।"

ছোটমাসি বেশ রাগের সুরে ছোটমামার দিকে তাকিয়ে বলল, "দ্যাখ দীপু, ছোটদের ভোলাচ্ছিস ভোলা, আমাকে ওইসব ম্যাজিক দেখাস না।"

"হেই, তিড়িবং তিড়িবং ইয়াক্কারায়, হারানো টুপি হাতে চলে আয়,"

বলেই ছোটমামা চট করে জামার পিছন থেকে টুপিটা বের করে ধরিয়ে দিলেন ছোটমাসির হাতে।

আর আমরাও অমনি জোরে হাততালি দিয়ে উঠলাম, যেন দারুণ ম্যাজিক দেখলাম। ছোটমাসি যেন বুঝতে না পারে, ছোটমামা টুপিটা সরিয়ে ফেলেছিলেন ওইভাবে।

ওদিকে ছোটমাসি তখনও হাতে পাওয়া টুপিটার দিকে একবার, ছোটমামার দিকে একবার, আর আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে, ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া টুপি ছোটমামার হাতে এল কীভাবে।

এমন সময় বুবলি ছুটে গিয়ে, হতবাক ছোটমাসির হাত থেকে টুপিটা কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল। তারপরে দু'কোমরে দুটো হাত রেখে বেশ দুষ্টুমিমাখা গলায় ছোটমামার দিকে তাকিয়ে বলল, "টাকডুমাডুম ডুম আর-একবার টুপিটা ফিরিয়ে নিয়ে এসো দেখি তিড়িবং তিড়িবং করে।"

বুবলির কাণ্ড দেখে কামরাসুদ্ধ লোক জোরে হেসে উঠল। সেই অবস্থায় জাদুকর টাকডুমাডুম ডুমের মুখের অবস্থাটা যদি তোমরা দেখতে!

ছবি: দেবাশিস দেব

কুইজ

বিজ্ঞানের নানা গবেষণা আর বিজ্ঞানীদের জীবন নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। এবারের কুইজ বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়েই।

১ নিজে এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন বিজ্ঞানী জন ডালটন। এই রোগটির প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তিনি প্রথম দেন। তাঁর নামানুসারে কোন রোগকে 'ডালটনিজ়ম' নামে ডাকা হয়?

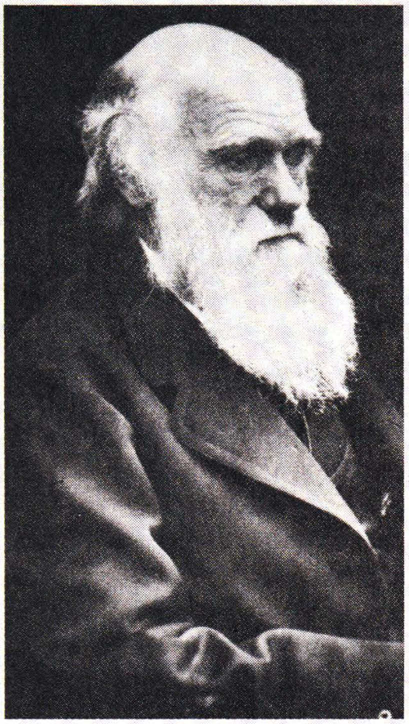
২ কোন বিখ্যাত পদার্থবিদ বঙ্গোড্রাম বাজানোয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন?

৩ রবার্ট কানিজেলের 'দ্য ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি' বইটি কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞকে নিয়ে লেখা?

৪ প্যারিসের রাস্তা পেরোতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানী?

৫ অ্যালান ম্যাথিসন টিউরিংকে বলা হয় 'ফাদার অফ — '। বলো তো শূন্যস্থানে কী বসবে?

৬ জন লর্ট স্টোক্স নামে এক নাবিক অস্ট্রেলিয়ার এই বন্দর-শহরের নতুন নামকরণ করেন এক বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীর নামে। কোন বিজ্ঞানী এবং শহরের নামই বা কী?





৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমিস্ট মেরিয়ান ডায়মন্ড কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে গবেষণা করেন?

৮ প্রতিবছর ১১ ফেব্রুয়ারি দিনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ন্যাশনাল ইনভেন্টরস ডে' হিসেবে পালিত হয়। কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্মদিন এটি?

গত সংখ্যার উত্তর

১. জোহানেস কেপলার।
২. সত্যব্রত দাম।
৩. ডেভিড।
৪. শুটিংয়ের ডাবল ট্র্যাপ ইভেন্ট।
৫. পপাই।
৬. ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স।
৭. বিজয় সিংহ।
৮. ব্র্যান্ডন রাউথ।

সঠিক উত্তরদাতা

এবারের সঠিক উত্তরদাতা মাত্র তিনজন — প্রীতম মণ্ডল, সপ্তম শ্রেণি, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাত; দেবশুভ্রা ঘোষ (ই-মেল) এবং অর্পণ সেনগুপ্ত, মল্লিকপাড়া, হুগলি।

অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১। ই-মেল anandamela@abpmail.com

জবাব চাই

১. কটোপ্যাক্সি আগ্নেয়গিরি কোন দেশে আছে?
২. 'অলিভার টুইস্ট' বইটি কে লিখেছিলেন?
৩. বিলুপ্ত ডোডো পাখির বসতি ছিল কোন দ্বীপে?

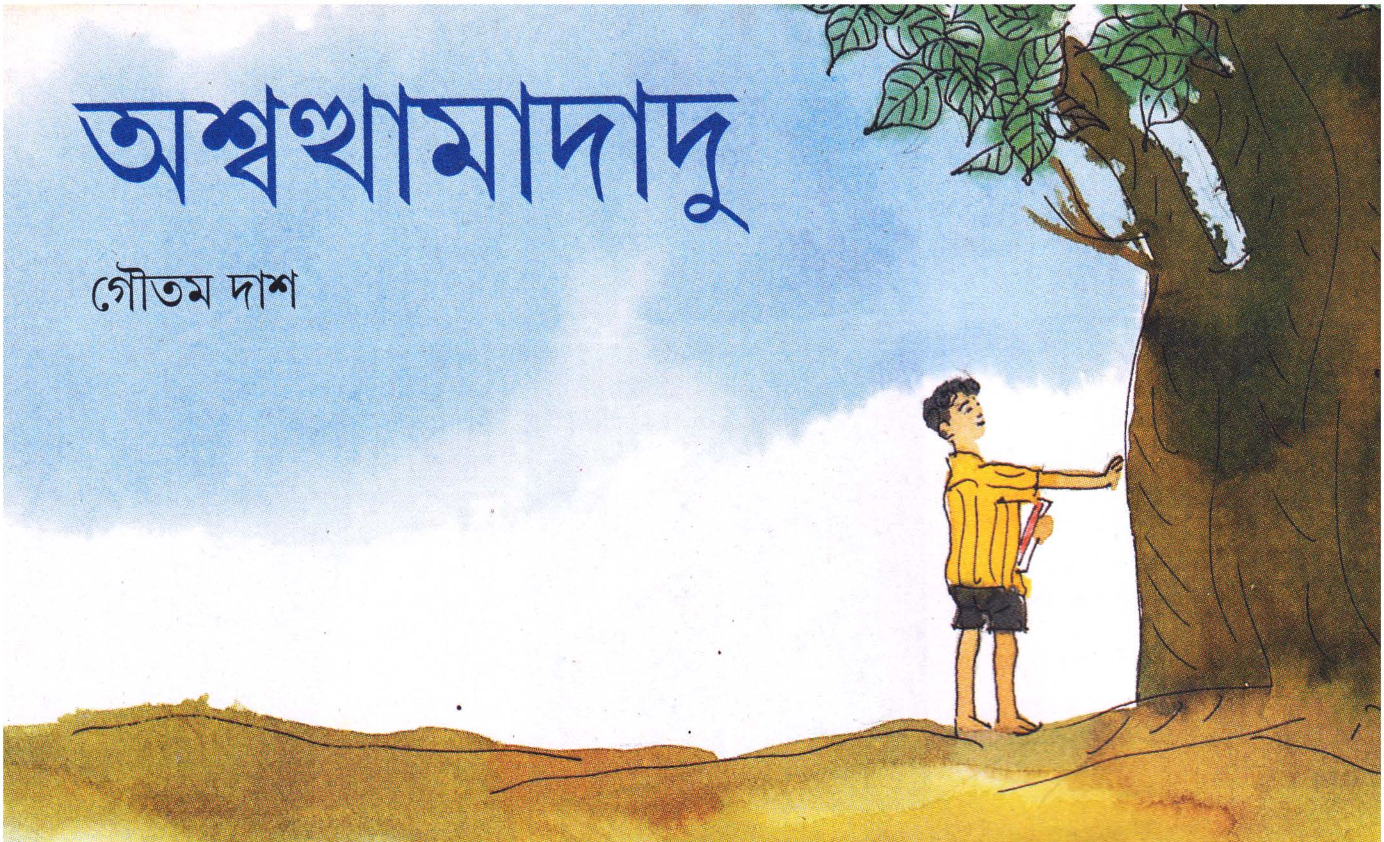
উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার জবাব চাইয়ের উত্তর

১. সুমো কুস্তি।
২. তাজমহল।
৩. শওকত আজিজ।

অশ্বত্থামাদাদু

গৌতম দাশ



"তাহলে স্যার ওই কথাই রইল। আগামী সরস্বতী পুজোর দিন আমাদের ওখানে যে ট্রেনটা সকাল ন'টা বারো মিনিটে যায়, ওই ট্রেনে আপনি যাচ্ছেন। আমরা স্টেশনেই থাকব। যদিও সবই আপনার চেনা।"

সাহিত্যিক আনন্দ দত্তর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে বিদায় নিল রুদ্রনগর গ্রামের 'মুক্তধারা' ক্লাবের ছেলেরা। ওরা সরস্বতী পুজোর দিন তাঁকে দিয়ে গ্রামের লাইব্রেরি উদ্বোধন করাতে চায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে একটা সংবর্ধনা দেবে। কারণ, প্রথমত, তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'যেখানে আকাশ নেই' বাংলা সাহিত্যের সেরা পুরস্কার পেয়েছে, যা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর জন্ম হয়েছিল ওই রুদ্রনগর গ্রামেই। শৈশব, বাল্য এবং কৈশোরের খানিকটাও ওখানেই কেটেছে। সে খবর নিয়েই ওরা এসেছে। সুতরাং ওখানকার ছেলেদের তাঁর কাছে যে একটা বিশেষ আবদার থাকতেই পারে, তা অস্বীকার করতে পারলেন না আনন্দ দত্ত। তাই হাতে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

রুদ্রনগর থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন উনিশশো বাহাত্তর সালে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করার পর। ওখানে কাছাকাছির মধ্যে কোনও ভাল কলেজ ছিল না। তা ছাড়া তাঁর বাবাও চাকরি করতেন কলকাতায়। বয়সের জন্য প্রতিদিন আসা-যাওয়া করাটাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন ভোরবেলা বেরিয়ে যেতে হত। ফিরতে-ফিরতে কমপক্ষে রাত ন'টা। প্রধানত এই দুটো কারণেই শেষপর্যন্ত রুদ্রনগরের সবকিছু বিক্রি করে কলকাতাতেই চলে এলেন আনন্দ দত্তের বাবা অপরেশ দত্ত।

কলেজে পড়তে-পড়তেই আনন্দ দত্তর সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি। তারপর ধীরে-ধীরে এতদূর এসেছেন। এখন বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে সকলে একডাকেই চেনে।

তবু ছেলেবেলাটাকে কখনও ভুলতে পারেননি আনন্দ দত্ত। হয়তো কেউই পারে না। কত নির্জন অবসরে তিনি চুপিচুপি ফিরে যান তাঁর আনন্দময় ছেলেবেলার রুদ্রনগরে।

আজও গেলেন। দেখতে পেলেন বছর দশ-বারোর আনন্দ নামের একটা রোগা-পাতলা, ফিনফিনে চেহারার ছেলেকে, যার সঙ্গে আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের বিশেষ মিল নেই। ছেলেটি সকলের সঙ্গেই খেলে বেড়ায় বটে, কিন্তু তবুও যেন সকলের চেয়ে একটু আলাদা। একটু বেশি অন্তর্মুখী। অনেক সময়ই একা-একা গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ায়। খেয়াঘাটের পাশে চুপ করে বসে থাকে, পালতোলা নৌকোর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। আপনমনে বিড়বিড় করতে-করতে পথ চলে।

গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে খেলার মাঠের পাশে ছিল একটা বিশাল অশ্বত্থগাছ। আনন্দ প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে যাওয়ার সময় এবং বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা থেকে নেমে ওই অশ্বত্থগাছটাকে ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করত, "ভাল আছ তো অশ্বত্থগাছ?"

বিকেলে ছেলের দল যখন মাঠে ফুটবল খেলত, অনেক সময়ই আনন্দ ওদের সঙ্গে না খেলে অশ্বত্থগাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ওদের খেলা দেখত। চলে আসার সময় ফিসফিস করে বলত, "বাড়ি গেলাম দাদু।"

একবার রাতে প্রচণ্ড ঝড়ে গাছটার একটা বড় ডাল ভেঙে গিয়েছিল। সকালে সেটা দেখে আনন্দ কেঁদে ফেলেছিল। গাছটার গায়ে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার খুব লেগেছে, তাই না দাদু?" আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছিল, কেননা, সদাই পড়েছিল জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, 'গাছেরও প্রাণ আছে, বোধ আছে'।



সেই বিশ্বাসেই অশ্বত্থামাদাদুর সঙ্গে আরও নানা কথা বলত। তবে গাছের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের ব্যাপারটা তার বন্ধু রমেন ছাড়া আর কেউই জানত না। অবিশ্যি রমেন তাকে কিছুটা পাগলের পর্যায়েই ফেলত। তবে এই নিয়ে কখনও ঠাট্টা বিদ্রুপ করেনি।

কলকাতায় চলে আসার আগের দিন বিকেলে বিদায় নিতে গিয়েছিল অশ্বত্থামাদাদুর কাছে। গাছটার গুঁড়িতে প্রণাম করে বলেছিল, "চলে যাচ্ছি দাদু। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! তোমার দুটো পাতা দাও দাদু।"

দুটো পাতা সন্তর্পণে ছিঁড়ে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এনেছিল আনন্দ। পাতা দুটো অনেকদিন ছিল তার কাছে। তারপর কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিল কে জানে!

রুদ্রনগরের ছেলেদের কাছে ওখানকার নানা জনের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাদের অনেকেই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, কেউ-কেউ মারাও গিয়েছেন। কিন্তু গাছটার কথা জিজ্ঞেস করতে একদম ভুলে গিয়েছিলেন আনন্দ দত্ত। এখন একেবারে হঠাৎই অশ্বত্থামাদাদুর জন্য মনটা কেমন করে উঠল। বড় দেখতে ইচ্ছে করল।

সরস্বতী পুজোর এখনও দিন দশ-বারো দেরি আছে। ঠিক করে ফেললেন, সরস্বতী পুজোর দিন নয়, তার আগের দিনই চলে যাবেন। একেবারে একা-একা। ছেলেবেলার সমস্ত প্রিয় জায়গাগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখবেন সারাদিন ধরে। তারপর রাত কাটানোর একটা জায়গা নিশ্চয়ই জুটে যাবে। অন্তত রমেনদের বাড়িটা তো আছে। ওদের কাছে শুনেছেন, রমেন এখন রুদ্রনগর গ্রামের স্কুলেই মাস্টারি করে।

সেইমতোই সরস্বতী পুজোর আগের দিন সকালে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরলেন আনন্দ দত্ত। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক লাগল। অন্তত তিরিশ বছর পরে স্টেশনটায় পা দিলেন।

চারদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিরিশ বছর আগের ছবিটার সঙ্গে কিছুই মেলে না। এত জমজমাট হয়ে গিয়েছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকের কানাই বারিকের মিষ্টির দোকানটা প্রায় একই রকম আছে। অবিশ্যি কানাই বারিককে দেখতে পেলেন না। বিশাল সাদা একজোড়া গোঁফ আর টকটকে ফরসা গায়ের রং ছিল ভদ্রলোকের। ফতুয়া গায়ে ক্যাশবাক্সের সামনে বসে থাকতেন। খুবই চালু ছিল দোকানটা।

রাস্তার দু'পাশে কত নতুন-নতুন দোকান গজিয়ে উঠেছে। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাটাও চমকে দেওয়ার মতো।

একটা সাইকেল রিকশায় উঠলেন আনন্দ দত্ত। রাস্তাটা স্কুলবিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে চলে গেছে রুদ্রনগরের দিকে। একসময় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন তিনি। সর্বত্রই পরিবর্তনের ছোঁয়া।

হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। অশ্বত্থামাদাদু আছে তো! তিরিশ বছর অনেকটা সময়। এর মধ্যে মানুষের দরকার অথবা প্রকৃতির রোষ যে-কোনওভাবেই গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

বেশ উদ্বিগ্নভাবেই রিকশায় বসে রইলেন আনন্দ দত্ত। তারপর যখনই রিকশাটা রুদ্রনগরের মুখে রাস্তার মোড়টা ঘুরল, দূর থেকে চোখে পড়ল অশ্বত্থগাছটা। একইরকম রয়েছে। রাস্তা থেকে একটু ভিতরে খেলার মাঠটার পাশে। দূরে গঙ্গার রুপালি রেখা চকচক করছে। মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

রিকশাটাকে বিদায় করে দিলেন আনন্দ দত্ত। রাস্তা ছেড়ে নেমে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললেন গাছটার কাছে। অজস্র কচি পাতায় ভরে আছে সারা গাছটা। খুব অল্প হাওয়াতেও অশ্বত্থগাছের কিছু-কিছু পাতা একটা নিয়মিত ছন্দে দোলে। এটা আগেও দেখেছেন, এখনও দেখলেন। এরকম করে বোধ হয় একমাত্র অশ্বত্থপাতারাই দুলতে পারে।

আস্তে-আস্তে পৌঁছে গেলেন গাছটার গুঁড়ির কাছে। পরম মমতায় গাছের গায়ে হাত রাখলেন। উপর দিকে তাকালেন। গাছের ফাঁকে সূর্যের আলোর ঝিলিমিলি। খুব অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ তো অশ্বত্থামাদাদু? চিনতে পারছ?"

গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আগে যেখানে বসতেন, সেখানেই বসলেন। হাত দুটো বুলিয়ে যেন গাছের গায়ের স্পন্দন অনুভব করতে চাইলেন। চোখ দুটো বুজে এল।

হঠাৎই মনে হল কপালের উপর যেন কিছু একটা পড়ল। চমকে চোখ খুলে দেখলেন কোলের উপর দুটো অশ্বত্থপাতা। লালচে সবুজ দুটো কচিপাতা।

আনন্দ দত্তের দু'চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কেন, সেটা তিনি নিজেও জানেন না। পাতা দুটো পরম যত্নে হাতে করে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন। ঠিক করে ফেললেন, আজ আর কোথাও যাবেন না। আরও খানিকক্ষণ অশ্বত্থামাদাদুর কাছে বসে কলকাতাতেই ফিরে যাবেন। আবার কাল এলেই হবে। আজকের দিনটা শুধু তাঁদের দু'জনের জন্যই থাক। আর অশ্বত্থামাদাদুর দেওয়া পাতা দুটো এবারে আর হারিয়ে যেতে দেবেন না। যত্ন করেই রেখে দেবেন।

ছবি: সুব্রত চৌধুরী



রিন্টুলের কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি না। আমার তো মনে হয়, ও একশোটা কথা বললে, তার মধ্যে সাড়ে সাতানব্বইটাই মিছে কথা। বাকি আড়াইটে মাত্র সত্যি। তবে ওর বলার ভঙ্গিটা এত ভাল যে, সবটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। আর যতক্ষণ ও হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গি করে তোমায় গল্প শুনিয়ে যাবে, ততক্ষণ কার সাধ্যি ওকে বিশ্বাস না করে?

যেমন ওর এই 'ভূতের বাক্স' গল্পটা। আচ্ছা তোমরাই বলো, এ কখনও সম্ভব? একটা চার ইঞ্চি বাই ছ' ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি বাক্সর মধ্যে একশোটা ভূত? যদিও ভূতের অস্তিত্বেই আমি বিশ্বাস করি না। তবু, আমার বড্ড ভয়। ধরো, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো মশারির গায়ে পড়লে, আমার গা কেমন ছমছম করে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যদি বাথরুম যাওয়ার দরকার পড়ে, তা হলে এমন শব্দটব্দ করি যে, মা'র ঘুম ভেঙে যায়।

"কী রে? কী হল? অত শব্দ করছিস কেন?"

"কিছু না, একটু বাথরুমে যাব।"

"তা যাবি, যা না। অত শব্দ করার কী আছে? দিলি তো কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে।"

মা'র অবশ্য যখনই ঘুম ভাঙে তখনই নাকি কাঁচা ঘুম। পাকা ঘুমটা যে কখন, কে জানে?

যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, তা হলে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যদি অবশ্য ভূত থাকেও, তা হলে তা অনেকটা বাঁধাকপির মতো। শতকরা সাড়ে ছিয়ানব্বই ভাগ জল। মাত্র সাড়ে তিনভাগ স্থূল বা ঘন বস্তু। অর্থাৎ, ভূত মূলত এইচ টু ও (H_2O)। বাঁধাকপির মতোই পাতা ছাড়িয়ে যাও। আবার পাতা। আরও ছাড়াও। আরও পাতা। শেষে এক মহাশূন্য। কিন্তু সেটাও তো বাঁধাকপিই বটে।

ভূতেরও তেমনই। খোসা ছাড়াও। আরও খোসা। আরও ছাড়াও। আরও খোসা। কিন্তু ভূত তো বটে। কোনও তরল ভূত নেই। ঘন ভূত নেই। সব বায়বীয়। জলীয় অংশেরও বাষ্পীভবন হয়ে গেছে। তরল পারে না।

আবার দ্যাখো, কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ অসংখ্য। এই যে রিন্টুল গল্পটা এতক্ষণ ধরে বলল, হ্যাঁ, সেই কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি।

গল্পটা বরং রিন্টুলের ভাষাতেই বলি। ভয় পেলে বলবে, দ্বিধা কোরো না। আমি না হয় থেমেই যাব। এখন শোনো।

"তোরা তো জানিস, প্রতি বছর গরমের ছুটিতে আমি মামাবাড়ি যাই। পুজোতে যাই না। এর পিছনে গুটিকয় কারণ আছে।

"প্রথমত গরমের সময় আম, জাম পাকে। কাঁঠালও পাকে, তবে আমি কাঁঠাল একদম ভালবাসি না। কিন্তু আমের ভক্ত। মামাবাড়িতে গোটাছয়েক গোরু আছে বলে পায়েস আর ক্ষীর প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ক্ষীর দিয়ে আম, সঙ্গে মর্তমান কলা। তা ভালই লাগে। হাফ-ইয়ারলির পরে, গরমের ছুটি পড়ে বলে, পড়াশোনার চাপ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, পুজোয় প্রতি বছর মেজোমামা, যিনি দেরাদুনে কোনও ফরেস্ট না কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন, তিনি আসেন। গ্রীষ্মে আসেন না। তাই পুজোয় যাই না।

"মেজোমামা এলেই, দেখতে পেলে আমায় নিয়ে পড়েন। অর্থাৎ আমায় পড়ান। একদম পেড়ে ফেলেন। অঙ্ক আর ইংরেজি ট্রানস্লেশন। পৃথিবীতে যেন আর কোনও সাবজেক্ট

বাক্সভর্তি ভূত

প্রদীপ্ত সেন



নেই। তাই পুজোয় মামাবাড়ি যাওয়া নেই। গ্রীষ্মে আছে।

"কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। আবার কাছেও নয়। বেশ গ্রাম-গ্রাম গন্ধ। অথচ আধা শহর। ইলেকট্রিক আলো আছে। টিভি আছে। পড়া নেই, টিভি আছে। পড়া নেই, খাওয়া আছে। কে না যেতে চায় বলো?

"এবার সেখানেই এই কাণ্ড।

"মামাবাড়ির কাছেই থাকে ফটিক, মানে ফটকেরা। ওরা নাকি একসময় এখানকার জমিদার ছিল। ওদের প্রাসাদ-টাসাদ, হাতি-ঘোড়া সব ছিল। এখন অবশ্য কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে কয়েকটা পুরনো ভাঙা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

"ফটকে আমার ওখানকার একমাত্র বন্ধু বলতে পারিস। একে আমার বয়সি, তা উপর চমৎকার গল্প বলতে পারে। এমন কোনও গল্পের বই নেই, যা ও পড়েনি। তবে বড্ড মিছে কথা বলে। ওর কোন কথাটা সত্যি আর কোনটা মিছে ধরা শক্ত। কারণ, এমনভাবে, এমন সময় ও কথাটা বলে, যা অবিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।"

"অনেকটা তোরই মতো," আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।

"না, আমি মোটেই মিছে কথা বলি না, যাহা বলি সত্য বলি। সত্য বই মিথ্যা বলি না," এক নিশ্বাসে একঘেয়ে সুরে আদালতে শপথ বাক্য পাঠ করার মতো করে রিন্টুল বলে যায়।

" 'অ্যাই ভন্ডুল, চুপ করবি? এখন শুনতে দে। পরে তোর মত প্রকাশ করবি,' বোঁচন বলে ওঠে।

রিন্টুল ফের শুরু করে, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ফটকেদের বাড়িতে অনেক মহল। অনেক বাড়ি। আসলে ওদের বাড়িটা সত্যিই বিরাট ছিল বোঝা যায়। ওর জ্যাঠা-কাকারা সব যে যাঁর দু'-তিনটে করে বাড়ি নিয়ে থাকেন। ওদের ভাগেও দুটো বাড়ি। সদর দিয়ে ঢুকলে ডান দিকে একটা দোতলা বাড়ি। তাতে মোট ছ'খানা ঘর। সামনে, আগেকার প্যাটার্নের টানা বারান্দা। জমি থেকে প্রায় দু'মানুষ সমান উঁচু। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। নীচের তলায় তিনটে ঘর। দোতলায়ও তিনটে। তার মধ্যে একটা ফটিকের পড়ার ঘর। পাশের দুটো ঘর চিরকাল বন্ধই দেখেছি। শুনেছি, নানা হাবিজাবি জিনিস দিয়ে নাকি ভর্তি। একতলার একটা ঘরে ফটিক। আর-একটায় ওর বোন আর মা-বাবা থাকেন। অন্যটা, গেস্ট এলে ব্যবহার করা হয়।

"দক্ষিণের ঘরগুলোয় প্রথমে রান্নাঘর। ওখান থেকে দেখা যায় কে এল, কে গেল। পাশে খাবার ঘর। তার পাশে বাথরুম। দোতলা বাড়িতে কোনও বাথরুম নেই।

" 'আরে ধ্যাত। গল্পটা বলবি তো। ওদের বাড়ির নকশা কে জানতে চাইছে?' এবার বোঁচনই বলে ওঠে।

আমি এ-সুযোগ ছাড়ি? "অ্যাই বোঁচন, চুপ করবি? শুনতে দে সবটা। বাড়ির প্ল্যানটা না জানলে গল্পটা বুঝবি কী করে? কোথায় খুনটা হল, কোথা দিয়ে আততায়ী পালাল। হাবিজাবির ঘরে কীভাবে গুপ্তধনের নকশা আর ধাঁধা পাওয়া গেল, সব বুঝতে হবে না?'

" 'সরি, এতে খুন নেই, গুপ্তধনও নেই। তবে গল্পটা বুঝতে বাড়িটার প্ল্যানটা জানা থাকলে ভাল হয়।'

আমার কথার উপর রিন্টুল একঘটি জল ঢেলে দিল, "এখন বকবক না করে শোন, দারুণ ইন্টারেস্টিং, তবে তার আগে ছ'টা আলুর চপ আন।"

"আছি পাঁচজন, ছ'টা কেন?"

"বাঃ, আমি গল্প শোনাব। তার ফিস নেই? যা যা, নিয়ে আয়। আজকের হোস্ট ভন্ডুল।"

"কেন? আমি কেন? আমি আগের দিনও খাইয়েছি।"

"বাঃ, আজ যে তুই বাজার করেছিস।"

"তার জন্য খাওয়াতে হবে?"

"বাজার থেকে তুমি কমিশন পাওনি বলতে চাও?"

অগত্যা, বাধ্য হয়েই আমায় উঠতে হল, "আমি না ফেরা পর্যন্ত কিন্তু গল্প আরম্ভ করা চলবে না।"

"না রে বাবা, ভয় নেই। বলব না কিছুই। এখন যা তো।"

আলুর চপ খেতে-খেতে ফের শুরু করে রিন্টুল, "এবার মামাবাড়ি গিয়ে দেখি ফটকে সেখানেই বসে আছে।"

" 'এই যে রিন্টুল, তোর জন্যই বসে আছি। মা তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আজ তুই আমাদের বাড়িতেই খাবি।'

" 'কেন? হঠাৎ আজই কেন?' আমি খাটের উপর কাঁধের ব্যাগটা নামাতে-নামাতে বলি।

" 'মায়ের আজ কী এক ব্রত আছে। বামুন চাই। খাওয়ানোর জন্য।'

আমি বললাম, "ভালই হল, বিকেলেই রিন্টুল আসছে। ওকেই বলি না কেন? বামুনও হল, আবার রিন্টুলও হল।"

" 'এখন শিগগির চল। মা উপোস করে আছে সারাদিন।'

"আমি বড়মামির দিকে তাকাতেই, তিনি চোখের ইশারায় সম্মতি জানালেন। সুতরাং এক ছুট, সোজা ওদের বাড়ি।

"সত্যি বলতে কি, ভালই হল। হোক ফলাহার, তবুও মনের সব দুঃখ-কষ্ট, গ্লানি মুছে গেল। মনে হল, আহা এরা কত সুখেই না আছে। আর তখনই নজরে পড়ল বাক্সটার দিকে। ফটকের পড়ার টেবিলের উপর রাখা বাক্সটার দিকে দেখলেই হাত দিয়ে নাড়তে ইচ্ছে করে। খুলে দেখতে ইচ্ছে করে।

"সামান্য কাঠের একটা বাক্স। চার ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি। ফটকেই বলেছিল। পরে অবশ্য মেপেও দেখেছি। ঠিক তাই। বাক্সটার উপরে রুপোলি পাত দিয়ে কাজ করা। দারুণ দেখতে।

" 'বাঃ, বেশ তো বাক্সটা।'

"যেন কিছুই হয়নি, এভাবে একঝলক বাক্সটার দিকে দেখে নিয়ে ফটকে অন্য কথা চালিয়ে যেতে লাগল।

" 'দেখি, বাক্সটা দেখি।' আমি হাতটা বাড়াতেই ফটিক হাতটা খানিকটা অভদ্রের মতোই সরিয়ে দিল।

" 'ওটা থাক। বাজে ঝামেলা।'

"ফটিক যত এড়িয়ে যেতে চায়, আমার ততই কৌতূহল বাড়ে।

" 'কেন? থাকবে কেন? দেখি না বাক্সটা। ক্ষয়ে তো আর যাবে না, বাক্সটায় হাত দিলে।'

"ফটকে কেমন তো-তো করে বলে, 'না, তা নয়। তবে ওসব জিনিস ঘাঁটাঘাটি না করাই ভাল।'

" 'ওসব জিনিস মানে? কী বলতে চাইছিস পরিষ্কার করে বল তো।'

" 'আসলে বাক্সটা আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার।'

" 'সে কী রে? এ তো দস্তুরমতো পুরাতাত্ত্বিক জিনিস। এর তো অ্যান্টিক ভ্যালু আছে। কলকাতায় বেচলে ভাল দামও পাবি।'

" 'না রে, ওটা বেচা যাবে না। মানে, বেচলেও ওটা আমাদের বাড়িতে ফেরত চলে আসবে।'

" 'মানে? এ তো রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপার।'

" 'তা বলতে পারিস,' ফটিক যেন মুখ খুলতে চাইছে না।

" 'কী ব্যাপার বল তো? তখন থেকে হেঁয়ালি করে কথা বলছিস। বাক্সটা নিয়ে কিছু বলতেও যেন তোর আপত্তি। এবার আমার রাগ চড়ছে, এতই যদি আপত্তি, তো টেবিলের উপর বাক্সটা সাজিয়ে রেখেছিস কেন? তাও তো, এখনও ভিতরে কী আছে দেখতে চাইনি। ওতে কী তোর ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সব গয়নাগাটি আছে নাকি?'

" 'তা হলে তো ভাবনাই ছিল না। ওসব গয়না বিক্রি করে, কবে আমরা কলকাতায় বাড়ি করে উঠে যেতাম। এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতাম? ওটার ভিতরে যা আছে, তা বলা বারণ।'

" 'বারণ? কেন? কার বারণ?'

" 'আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায়ের। সাংখ্য বেদান্তাচার্য, তান্ত্রিকসম্রাট শ্রী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বিসূচিকার্ণব পরম ভট্টোপাধ্যায়ের ধারণা।'

" 'দ্যাখ ফটকে, গুল মারবি না। তুই কী ভেবেছিস, আমি ইংরেজি স্কুলে পড়ি বলে বাংলা জানি না? বিসূচিকা মানে কলেরা। সেটা কী আমার জানা নেই নাকি? আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত একটা পঞ্জিকার নাম, সেটা আমি জানি না ভেবেছিস? ভট্টোপাধ্যায় পদবি আছে কি না জানি না। তবে ভট্ট আর উপাধ্যায় দু'টোই ব্রাহ্মণের পদবি এটা জানি। তোরা সরকার। ভট্টোপাধ্যায় কবে হলি রে? তোরা কি বামুন?'

" 'কী জানি ভাই, অত জবাব দিতে পারব না। বাবার মুখ থেকে যা শুনেছি, তাই বলছি। হতে পারে সরকারটা টাইটেল। আমরা আসলে ভট্টোপাধ্যায়। কিংবা ওটাই পাওয়া উপাধি। কে জানে?'

" 'কিন্তু সে তর্ক থাক, ওঁর বারণ, তাই বলি না। তবে সে বারণের পরেও তো একশো বছর পার হয়ে গেছে। এখন বলা যেতে পারে বোধ হয়। কারণ, প্রতিটির জন্য যদি এক বছর ধরা যায়, তা হলেও একশো বছর, তা হ্যাঁ, উনিশশো সাল থেকে দু'হাজার সাল, একশো বছরই তো হল।'

" 'কী আজেবাজে বকছিস বল তো? একশো বছর। প্রতিটির জন্য একবছর। এসবের মানে কী?'

" 'বলছি, বলছি। সব বলব। কিছুই গোপন করব না। তবে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। আর অবিশ্বাস করা চলবে না। প্রশ্ন করা চলবে না। এবং—। আচ্ছা, এবংটা না হয় পরেই বলব। এখন শোন।

" 'আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বিসূচিকার্ণব ছিলেন বিরাট মাপের মানুষ। জমিদারিও চালাতেন, আবার তন্ত্র সাধনাও করতেন। শোনা যায়, তাঁর ভয়ে লোকে নাকি



বাক্সভর্তি ভূত

মধ্যরাত্রে গোপনে-গোপনে তিন ক্রোশ দূরের ভুসুরিডাঙার মাঠে নিয়ে গিয়ে শবদাহ করত। কারণ, তিনি মড়া পেলেই কেড়ে নিয়ে গিয়ে এখানকার শ্মশানে মড়ার উপর বসে পড়তেন!'

" 'কেন?' আমি একটু অবাক হই।

" 'কেন আবার, তন্ত্রসাধনা। জানিস না, তান্ত্রিকরা মড়ার উপর বসে সাধনা করে! আর অপঘাতের মড়া হলে তো কথাই নেই। শোনা যায়, ওই অপঘাতে মৃত শব জোগানের জন্য তিনি নাকি দু'-চার-পাঁচটা খুনও নিজে হাতে করেছিলেন।'

"ফটিকটা একটু ডাকবুকো আছে ঠিকই। তবে এই ভর সন্ধেবেলায় এসব কথা কি না বললেই নয়? সত্যি বলছি, আমার কেমন গা ছমছম করে উঠল।

" 'থাকগে, ওসব কথা এখন থাক। বরং কাল যে তোদের খেলা ছিল সে কথা—'

" 'চুপ কর। কথা যখন উঠেছে। তখন সবটা বলতেই হবে। নয়তো কী হবে জানিস?'

"অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু লাইট জ্বালাবার কথা দু'জনে ভুলেই গিয়েছি। এ যেন আমার বন্ধু সে ফটকে নয়। অন্য কারও গলায় ফটিক কথা বলছে।

"সত্যি বলছি। আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল, 'আমার সেই ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাক্স এটা। মেহগনি কাঠের বাক্স। উপরে রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। ওটা ওঁর মন্ত্রপূত বাক্স। বিশেষভাবে তৈরি। কিন্তু খোলার উপায় নেই।'

" 'কেন?'

" 'সব বেরিয়ে যাবে যে! তাই ওটা মন্ত্র দিয়ে খোলা হয়, মন্ত্র দিয়েই বন্ধ করা হয়।'

" 'তা হলে সামনে ওই চাবির ফুটোটা কী?' অনেক কষ্টে আমি উচ্চারণ করি।

" 'ওটা কথা বলার আর শোনার।'

" 'কী যে বলিস না ফটকে! কে বলবে? আর কে-ই বা শুনবে?'

" 'শুনব আমরা। আমি, তুই। তোর মেজোমামা আমার সেজোপিসেমশাই, সবাই। আর বলবে, যে মন্ত্র জানে শুধু সেই। কারণ, সে নির্দেশ দেবে।'

" 'দ্যাখ ফটকে, ইয়ার্কি মারিস না। আমি বরং আজ চলি। দেরি হলে বড়মামা বকবে।'

" 'যাব বললেই কী চলে যাওয়া যায়? সবটা শুনতে হবে না? এ কাহিনি শুরু করলে যেমন শেষ করতে হবে, তেমনই শেষ অবধি শুনতেও হবে।'

"আমি কেমন হতভম্বের মতো বসে থাকি। ফটিক বলে চলে, 'আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সাংখ্য বেদান্তাচার্য, তান্ত্রিকসম্রাট শ্রী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বিসূচিকার্ণব পরম ভট্টোপাধ্যায় এই বাক্সটা তৈরি করিয়ে ছিলেন কেন জানিস?'

"আমি বোকার মতো ঘাড় নাড়ি।

" 'ভূত জমাবেন বলে।'

" 'তার মানে?'

" 'মানে ভূত জমাবেন। লোকে স্ট্যাম্প জমায়, কয়েন জমায়, খেলনা জমায়, বই জমায়, মূর্তি জমায়, ছবি জমায়, এমনকী পোকামাকড় পর্যন্ত জমায়। ওঁর শখ ছিল ভূত জমানোর।'

" 'কী অবাস্তব শখ!'

" 'কেন? অবাস্তব কেন?' ফটিক তেড়ে ওঠে।

"কথায় বা গায়ের জোরে কোনওটাতেই ফটিকের সঙ্গে পেরে উঠব না। বলি, 'অবাস্তব নয়? ভূত কি বাস্তব নাকি? বস্তু? ধরাছোঁয়া যায়?'

" 'বস্তু নয়। কিন্তু বাস্তব। যেমন তোর সামনে আমি বসে আছি। আমি মানুষ না ভূত? ছুঁয়ে দ্যাখ, আমি বাস্তব কিনা?' ও আমার দিকে হাত বাড়ায়।

"আমি একটু সরে বসি।

" 'আমার শরীরের ভিতর দিয়ে হাত গলে যাবে। ছুঁয়ে দেখতে পারবি না। অথচ আমি তো আছি। তোর সামনেই আছি। দে তোর হাতটা। দ্যাখ, হাত গলে যায় কি না?'

"সত্যিই তো! মামাবাড়ি থেকে ফটিক ডেকে নিয়ে এল। সোজা উপরে ওর পড়ার ঘরে। ওদের বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা তো হল না। ওর বোনটা কোথায় গেল? কাকিমা যে উপোস করে আছেন বলল, তিনিই বা কোথায়? এ কোন ফটিক রে বাবা! আমাদের ফটিক বেঁচে আছে তো? বড়মামি তো কিছু বললেন না। বরং চোখ নাচিয়ে মতই দিয়েছিলেন।

"আবার মামার বাড়িতেও তো বড়মামি ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। সব হল কী? এ তো আর সেই আগেকার দিন নয়, যে কলেরায় গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

"আমি দস্তুরমতো ঘামছি।

" 'উনি ভূত জমাতেন। ইচ্ছে ছিল একশো একটি ভূত উনি জমাবেন। কিন্তু—'

"ফটিক কেমন অন্যমনস্ক, আমার গলা দিয়ে ফিসফিস করে বের হল, 'কিন্তু কী?'

" 'কিন্তু শেষ ভূতটিকে ভরবার লোক পাওয়া গেল না।'

" 'কেন?'

" 'কারণ, তিনি ছাড়া আর কেউ এই বাক্সের ভিতর ভূত ভরতে জানেন না, তাই। কারণ, উনি ঠিকই করে রেখেছিলেন বাক্সের একশো এক নম্বর ভূতটি হবেন উনি নিজে। একশো ভূতের রাজা। এক-এক করে তাই অতি যত্নভরে একশো ভূত ধরে এই বাক্সে ভরে রেখেছিলেন। যেদিন একশো নম্বরটি ভরলেন, সেদিন তাঁর আনন্দ দ্যাখে কে? ঠিক করেছিলেন এবার তাঁর বড় ছেলে অর্থাৎ আমার ঠাকুরদার বাবাকে শিখিয়ে দেবেন, কীভাবে ভূত ভরতে হয়। আর তিনি মরে গেলে তাঁর আত্মা বাছাধনকে নিয়ে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরে ফেলবেন এই বিশেষভাবে প্রস্তুত মন্ত্রপূত বাক্সে।'

" 'কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর-এক। দুই 'ভ' ভগবান আর ভূত দেয় সব পালটে। আর ঠিক তাই হল।'

" 'একশোতম ভূতটিকে বাক্সে পুরে শ্রীল শ্রীযুক্ত আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা যখন তাঁর বড় ছেলেকে সব বলে যাওয়ার

প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখনই ঘটল কাণ্ডটা।'

" 'আমার ঠাকুরদার ঠাকুরমাকে খান্ডারনি বললে কম বলা হবে। তাঁর ভয়ে সবাই থাকত সদাই থরহরি কম্পমান। অমন যে দাপুটে তান্ত্রিকসম্রাট শ্রী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বিসূচিকার্ণব আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তিনিও তাঁর স্ত্রীর ভয়ে থরথর করে সত্যিই কাঁপতেন। তাঁর যত কাপ্তেনি সব ভূতটুতদের নিয়ে। মড়া নিয়ে কত সহজে লোফালুফি খেলতেন। কিন্তু তাঁর গিন্নির সামনে পড়লে তিনি জুজু। তখন মুখ দিয়ে সাত চড়ে রা নেই। যা কিছু বলার তাঁর গিন্নিই বলবেন। তিনি শুধু শোনার জন্য, আর গিন্নির হুকুম তামিলের জন্য। সোজা কথায় আমার সেই ঠাকুরদার ঠাকুরমা শ্রীযুক্তা কৌমুদীপ্রকাশনী দেবীর ভয়ে, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত বললেও কম বলা হবে। তিনি আদেশ করলে বাঘে গোরুর জাবনা খেত, গোরুতে ইঁদুর খেত, ইঁদুর বিড়াল খেত, বিড়াল অজগর সাপ খেত, অজগর ঘাস লতাপাতা খেত ইত্যাদি ইত্যাদি, যা কিছু অসম্ভব সবই ঘটতে পারত। পারত নয় ঘটত। এবং কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেললেন, সেই কৌমুদীপ্রকাশনী দেবী।'

" 'সবে তখন আমার ঠাকুরদার, ঠাকুরদা একশোতম ভূতটিকে বাক্সে ভরে ফেলেছেন, আর গলা মোরগের মতো ফুলিয়ে বড় ছেলে ভ্যাবা বা শ্রীমান ভ্যাবলাকান্তকে ডাকার জন্য ভ্যা করেছেন অমনি, 'সকাল-সন্ধে ওই ছাতার মাথা বাক্স নিয়ে কী হচ্ছে শুনি? রাতদিন ওই ভূত ধরার বুজরুকি করলে চলবে? যাও, গোরুগুলো অনেকক্ষণ না খেয়ে আছে। ওদের জাবনা দিয়ে এসো দিকি।' বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের ভ্যা, ভ্যা-ই রইল। আর ভ্যাবা বেরোল না। তিনি বাক্যটি ব্যয় না করে উঠে যাচ্ছিলেন।

" 'ও কী? ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? গোয়াল কি ওইদিকে নাকি?'

" 'না, এই বাক্সটা ভ্যাবার কাছে দিয়ে...'

"তাঁর মুখের কথা শেষ আর হল না।

" 'ধ্যাত্তেরি, নিকুচি করেছে। মিন্‌সের ভীমরতি ধরেছে। কী এক বাক্স-বাক্স করে পাগল করবে দেখছি। আজ তোমার বাক্সের শেষ দেখব আমি।'

"মুহূর্তের মধ্যে এই ভূতের বাক্স শ্রীমতী কৌমুদীপ্রকাশনীর হাতে। আর তার পরের মুহূর্তেই ঝপাং। বাক্স পুকুরের জলে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝপাং।

" 'আবার ঝপাং কিসের?' এতক্ষণে আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হল। এতক্ষণ একমনে ফটকের কথা শুনছিলাম।

" 'এবারের ঝপাং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বিসূচিকার্ণবের।'

"কৌমুদীপ্রকাশনী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গেল গেল! ওরে কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়। মিন্‌সে সাঁতার জানে না যে! ও মা আমার কী হবে গো!' ইত্যাদি।

"আর কোথায় কে! সবাই যে যেখানে ছিল দৌড়ে এল। দু'-চারজন মালকোঁচা মেরে জলে ঝাঁপও দিল। না, শেষরক্ষা আর হল না। বিসূচিকার্ণবের প্রাণহীন দেহটা যখন উঠল, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাক্সটা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিক। কারণ দেহের সঙ্গেই উঠল সেটা। দু'হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছেন। একশোটা ভূত ভরা বাক্সটায়, একশো একতম ভূতটিকে আর ভরা হল না। কারণ, ভ্যাবা জানেন না বাক্স খোলার মন্তর। জানেন না ভূত ধরার বা ভরার কায়দা। এই হল সেই একশো ভূতের বাক্স।"

গল্পটা শেষ হতে আমিও এবার একটু মনে জোর পাই, "তা কী দরকার ওই বাক্স বাড়িতে রাখার? ফেলে দিলেই তো পারিস।"

"ফেলব বললেই কি আর ফেলা যায়? সে চেষ্টা তো হয়েছিল। ওই মরাকান্নার মাঝেই আমার ঠাকুরদার ঠাকুরমা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'ওই সেই অলক্ষুনে বাক্স। ওর জন্যই মিন্‌সের প্রাণ গেল গো। দে, দে ওটাকে বিদেয় করে।' বলে একটান দিয়ে বাক্সটা নিয়ে ফের ঝপাং। কিন্তু...

" 'কিন্তু মানে?'

" 'শবদাহ করে সবাই যখন ফিরে এল, ওটা তখন যথাস্থানে।'

" 'যথাস্থানে মানে?'

" 'ঠাকুরদার ঠাকুরদার বিছানায় বালিশের পাশে। শুকনো খটখটে। কোনওদিন যে ওটা জলে ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। তারপর থেকে ওটাকে বিদায় করার বহু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু না, সব বৃথা। সর্বদাই পরের দিন ওটা যথাস্থানে। এমনকী, আমার ঠাকুরদার বাবা ওটা নিয়ে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে ফেলে এসেছিলেন। তিনি ইলাহাবাদ থেকে ফেরার আগেই ওটা ফের যথাস্থানে। এর পর থেকে কেউ চেষ্টা করেনি। করে লাভ নেই জেনে। সেই থেকে এ-বাড়িতেই ওটা আছে।'

" 'তার মানে , এখনও ওতে একশো ভূত ভরা?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

" 'তাই-ই তো। ওটা সেই একশো ভূতের বাক্স।'

" 'তোদের ভয় করে না? একশো ভূত নিয়ে ঘর করিস?'

" 'ঠিক তা করে না। কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া এ-বাড়ি ছেড়ে যাবই বা কোথায়?'

" 'ভূতগুলো ভয় দেখায় না?'

" 'সেটাই তো আসল কথা। সেকথা বলতেই তো এত কথা বলা। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত তো আর বেছে-বেছে দেখেশুনে ওতে ভূত ভরেননি। যখন যাকে পেয়েছেন, খপ করে ধরে তাকে ওই বাক্সে পুরেছেন। ওতে তাই নানারকমের ভূত আছে। একেবারে গুগাবাবার গানের মতো। বেঁটে, লম্বা, রোগা, মোটা, কালো, ফরসা, ছোট, বড়, রুগি, উকিল, মক্কেল, সব এক বাক্সে ভরা। তবে মন্ত্রপূত বাক্স বের হওয়ার উপায় নেই। না থাকুক, দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভূতের সঙ্গে মানুষ পারবে কেন, বল? তাই এদের নানারকম কীর্তিকলাপ আছে।'

" 'বেরোতেই যদি না পারে, তবে আর কীর্তিকলাপ কী?'

" 'তবে আর বলছি কী? এই সেদিন, দিনদশেকও হয়নি বোধ হয়। আমার সেজোপিসেমশাই এসেছিলেন। তুই তো তাঁকে দেখেছিস। ইয়া রাশভারী চেহারা। বিহারের কোথায় নাকি দারোগার চাকরি করেন। জামতাড়া না আমতাড়া কে জানে, ইয়া বিশাল গোঁফ। ওঁর চিরদিনের অভ্যেস নিজের ক্ষুর



দিয়ে নিজেই দাড়ি কামান। আসলে পুলিশ তো। কাউকে বিশ্বাস করেন না। কে জানে, কে কোথায় নাপিতের ছদ্মবেশে, ক্ষুরটা বেঁকিয়ে ধরে, দেবে একটুখানি টেনে, ঘ্যাঁচ করে। ব্যস, অমন জাঁদরেল বেচুদারোগা, আমার সেজোপিসে একদম না হয়ে যাবে।'

" 'না হয়ে যাবে মানে?'

" 'না মানে না। এই ছিল, এই নেই। বেচুদারোগার লাশ পাওয়া যাবে। যাকগে, যা বলছিলাম। সেজোপিসের গল্প তোকে আর-একদিন শোনাব। আজ ওই বাক্সের কথা শোন। তা বললাম না, সেজোপিসে দিনদশেক আগে এসেছিলেন। তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এই ঘরেই। ওই জানলার ধারের খাটটায়। সক্কালবেলা মুখ-হাত ধুয়ে পিসে তো যথারীতি ক্ষুর বের করে দাড়ি কামাতে লেগেছেন। ওই যে দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটা, ওটার সামনে দাঁড়িয়ে, গালে সাবানটাবান বুলিয়ে, অনেক ফেনা করে, সবে ক্ষুরটা গালে দিয়েছেন।'

" 'কী হল, থামলি কেন? বল।'

" 'দাঁড়া বলছি। দেখছিস না, ভাবলেই আমার কেমন লোম খাড়া হয়ে উঠছে। তা বেচুদারোগা তো সবে জুলফির কাছ থেকে ডান গালে একটুখানি টেনেছেন, কে যেন ওঁর পিছন থেকে গমগমে রাশভারী গলায় বলে উঠল, 'ধুর, ওভাবে ক্ষুর ধরে নাকি? দাড়ি কামাতেও শেখোনি। ঠিক করে ক্ষুর ধরো।'

" 'ব্যস। সেজোপিসে ভয়টয় পেয়ে, হাতটাত কেঁপে, গালটাল কেটে একাকার কাণ্ড। কোথায় ডেটল, কোথায় তুলো, কোথায় ব্যান্ডেজ। ব্যস, পিসের দফারফা। আসলে উনি এসেছিলেন কলকাতায় কী একটা বড় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। তা আর হয়? পুলিশের দারোগা। আরও বড় চাকরি। অমন কাটা গালে ফেট্টি বেঁধে গেলে চাকরি হয়? তাই হল না। এদের কীর্তিকলাপ বলছিলাম না?'

" 'তা এ নিয়ে চেঁচামেচি হল না?'

" 'হল তো। বাড়ির সবাই তো বুঝতেই পারছে ব্যাপারটা কী। কিন্তু পিসের সামনে ফাঁস করার দরকার কী? তাই চেঁচামেচি হল, 'অ্যাই কে রে? কে রে?' করা হল। সবাই বাড়ির আনাচকানাচ খোঁজার ভাণ করল। কোথায় কে? আসলে আমরা তো জানিই দায়ী কে?'

" 'একশো ভূত মিলে, একশো বছরে শেষমেশ এই কাণ্ড ঘটাল?'

" 'দুর বোকা। একটা তো তোকে বললাম। অমন কত-কত কাণ্ড। একশো বছরে নেই-নেই করে তা ন'শো কাণ্ড তো বটেই।'

" 'আমি তখন খুব ছোট। বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। মুখে বাঁদুরে টুপি দিয়ে, হাতে বন্দুকটন্দুক নিয়ে নকল গলায় হা-রে-রে-রে করতে-করতে তা প্রায় দশ-পনেরো জন ডাকাত হবে।'

" 'দরজাটরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে সবাইকে পিছমোড়া করে বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তারা তো নিশ্চিন্তে লুঠপাট করে নিল।'

" 'তখনও আমার ঠাকুরমা বেঁচে। সব কিছু বস্তা আর বিছানার চাদরে বেঁধে নিয়ে, তাদের সর্দার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বলল, 'অ্যাই বুড়ি। তোদের বাড়িতে নাকি মুরগির ডিমের মতো বড়-বড় মুক্তো আর কাকের ডিমের মতো হিরে আছে? সেগুলো কোথায়?'

" 'ঠাকুরমা কথা বলবেন কী, তাঁর তো মুখে কাপড় গোঁজা। বললেন, 'হুঁ, হুঁ, উঁ উঁ।'

" 'কী উঁ উঁ করছিস? কোথায় আছে বল। নয়তো সবাইকে জানে মেরে দেব।'

" 'হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, তাও আবার নাকি গলায়, 'আঁমি বঁলছি।'

" 'কে, কে? কে বলল কথাটা?' সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। বাড়ির সবার মুখ বন্ধ। হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। তবে? এদিকে আমরা তো বুঝতে পারছি এসব কাদের কথা। ঠাকুরমা বলে চলেছেন, 'উঁ উঁ, উঁ হুঁ।'

" 'উঁহুঁ উঁহুঁ করিস না। না বললে এরা তোদের ছাড়বে ভেবেছিস?'

" 'কারও কথা বলার উপায় নেই। অথচ কথা আসছে। ডাকাতদল এবার সত্যি ভয় পেয়েছে। তবু সর্দারটা সাহস করে বলল, 'কোথায় আছে শুনি?'

" 'এঁমনি-এঁমনি বঁলব কেঁন? আঁমায় ছাঁড়ান দেঁ। তঁবে বঁলব।'

" 'ডাকাতসর্দার কী বুঝল, কে জানে? ফস করে ঠাকুরমার মুখের কাপড়টা খুলে নিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরমার চিলচিৎকার, 'বাঁচাও-বাঁচাও। ডাকাত-ডাকাত। কে কোথায় আছ।'

" 'আঁরে ওঁকে নঁয়। আঁমাকে আঁমাকে। আঁমাদের আঁমাদের।'

" 'এদিকে ঠাকুরমার চিৎকারে আশপাশের সব বাড়ি থেকে লোক বেরোতে শুরু করেছে। লাঠি, টাঙ্গি যে যা পারছে নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে ছুটছে। ডাকাতদল দিশেহারা। কী করবে বুঝতে না পেরে, পোঁটলাপুঁটলি ফেলে, দে-দৌড়, দে-দৌড়।'

" 'দৌড়ে যাবেই বা কোথায়! চারদিকে লোকজন। হইহুল্লোড়, চেঁচামেচি। সর্দারসমেত তিনজন ধরা পড়ল। চারজন গণপ্রহারে মারা পড়ল। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হল, অবশ্যই পুলিশ প্রহরায়। আর আমার ঠাকুরমা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ডাকাত ধরার জন্য হাজার টাকা পুরস্কার পেলেন। জিনিস তো কিছু খোয়া গেলই না, বরং হাজার টাকা লাভ।'

" 'আর পরদিন সকালে আমার ঠাকুরমা ঘুম থেকে উঠতে-উঠতে শুনলেন, সেই খোনা গলায় কে যেন বলছে, 'এঁটা কিঁন্তু তোঁর ঠিঁক হঁল নাঁ পুঁটি।'

" 'আমার ঠাকুরমা তাঁর দিদিশাশুড়ির চেয়ে কিছু কম খান্ডারনি ছিলেন না। কোথায় ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরপ্রণাম করবেন, তা নয়। একেবারে মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'কোনটা ঠিক হল না শুনি?'

" 'এঁই ভাঁলমানুষের বেঁটাদের পুঁলিশে ধঁরিয়ে দেঁওয়া।'

" 'কী? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? আমারই খাবি, আমারই পরবি, আবার আমারই নিন্দেমন্দ করবি?'

" 'বাঁজে বঁকিস নাঁ পুঁটি। আঁমাদের কঁবে খাঁইয়েছিস শুঁনি? এঁই নঁব্বুই বঁছরে এঁকদিনও এঁক বেঁলার জঁন্যও খাঁইয়েছিস?'

" 'তবে রে পাষণ্ড, পামর, অকৃতজ্ঞ, ছোটলোক। আমরা না থাকলে তোরা বাঁচতিস? কোথায় থাকতিস? শ্মশানে, মগডালে, পোড়ো বাড়িতে, বেলগাছে, শ্যাওড়াগাছে তো থাকতে হত। আমাদের বলেই না বাক্সের ভিতর আরামে আছিস। দাঁড়া, আজ তোদেরই একদিন কী আমারই একদিন। কর্তা উঠুক ঘুম থেকে, তোদের কী করি দেখবি।' ইত্যাদি অনেক কথা ঠাকুরমা বলে চললেন। আর তাঁর চিলচিৎকারে বাড়ির সবাই ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

" 'আমার মা খুব শান্ত মানুষ, দেখেছিস তো! উনি শুধু ঘোমটার আড়ালে থেকে বললেন, 'থাকগে, ছেড়ে দিন মা, যেতে দিন। ওরা কি মানুষ?'

" 'মানুষ নয় তো মানুষের ব্যাপারে থাকতে যায় কেন? আমাদের মুরগির ডিমের সাইজের মুক্তো আছে, না? তা হলে আর তোদের পুষতে যাব কেন? হতভাগারা?'

" 'অ্যাই কে আছিস, ডাক দেখি বিনোদ ওঝাকে, ব্যাটাদের আরও তিনহাজার তিনশো তেষট্টি বছর ঘানি টানাক এসে।'

" 'বাক্সের ভূতের তেজ তখনও যায় না। ওর ভিতর কে একটা বলে উঠল, 'কেঁ বিঁনোদ?"

" 'কে বিনোদ? চেনো না তাকে, না? মার্তণ্ড ওঝার ছেলে প্রচণ্ড ওঝার নাতি বিনোদকে চেনো না? এলে পরে বুঝতে পারবি কে বিনোদ। যখন ঘানি টানাবে, পাথর ভাঙাবে, তখন বুঝবে কে বিনোদ।"

" 'তারপর বিনোদ এল?'

" 'আরে দুর। কোথায় বিনোদ? তার নাম তো সর্বেশ্বর। আর সে ওঝাগিরি জানে নাকি? সে তো রেলে কাজ করে, গ্যাংম্যান। ঠাকুরমার কাণ্ডই ওরকম। তবে ভূতগুলো বেজায় ভয় পেয়েছিল, তার প্রমাণ, এ-ঘটনার পর তিনমাস চুপ করে ছিল।'

" 'সব সময় কি ভূতগুলো তোদের ক্ষতি করার চেষ্টাই করে?'

" 'তা কেন? উপকারও তো করে। বড়কাকার দাঁতের ব্যাপারটাই দ্যাখ না।'

" 'তোর বড়কাকার দাঁত? কী হয়েছিল?'

"আর বলিস না। সে এক কাণ্ড! এই তো গত বছর। স্কুল থেকে বাড়িতে পা দিয়েছি আর বড়কাকা খপাত করে আমায় ধরলে, 'ফটকে, আমার দাঁত দেখেছিস?'

"আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, ' মানে?'

" 'মানে, আমার দাঁত দেখেছিস?'

"মনে-মনে বললাম, তা আর দেখিনি? দিনরাত দাঁত খিচোচ্ছ, আর তোমার দাঁত দেখিনি? মুখে বললাম, 'বুঝলাম না। তোমার দাঁতে আবার কী দেখার আছে? সোনা দিয়ে বাঁধালে বুঝি?'

" 'আরে ধ্যাত। এ ছোঁড়া আচ্ছা গবেট। আরে আমার সামনের বাঁধানো দাঁত দুটো দেখেছিস?'

"মনে পড়ল বড়কাকার সামনের নীচের দাঁত দুটো ভাঙা। তাই ও দুটো বাঁধানো। ছেলেবেলায় নাকি উঠোনে পা পিছলে পড়ে গিয়ে দাঁত দুটো ভেঙেছিল। আমার অবশ্য মনে হয় মিছে কথা। ও দুটো মাস্টার মেরে ভেঙে দিয়েছিলেন, অঙ্ক পারেনি বলে। নইলে আমায় অমন করে?

"যাই হোক, বললাম, 'তোমার দাঁতের খবর তুমিই জানো। আমি জানব কোত্থেকে? আমি তো সবে স্কুল থেকে ফিরছি।'

" 'তাও বটে।' বড়কাকা থেমে গেল।

"কিন্তু না, থামল না। বাড়ির সবাই হয়রান। বড়কাকার বাঁধানো দাঁত পাওয়া যাচ্ছে না। আনাচেকানাচে, বইয়ের তাকে, জলের গেলাসে, এমনকী নর্দমায়, শেষ পর্যন্ত ইঁদুরের গর্তেও খোঁজা হল। কিন্তু কোথায় কী! বড়কাকার দাঁত ভ্যানিশ। বাড়িময় হইচই। এ-ঘরে জোর আলোচনা চলছিল দাঁত অদৃশ্য হওয়া নিয়ে। হঠাৎ মিনমিনে গলায় কে যেন বলে উঠল, 'দাঁত আবার যাবে কোথায়? দাঁত তো পেটের মধ্যে।'

"ব্যস। বড়কাকার মনে পড়ে গেল, দুপুরে ভাতঘুম দেওয়ার সময় দাঁত খুলতে ভুলে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই গিলে ফেলেছে।



বাক্সভর্তি ভূত

"কিন্তু কে বলল কথাটা? কে? কে? কেউই যখন স্বীকার করল না, হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাক্সটার কথা। বললাম, 'ভূতে।'

"সবাই বলল, 'হ্যাঁ ঠিক, চলো বড় ডাক্তারের কাছে।' তারপর পেটের এক্স-রে টেক্স-রে করে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

"এ আর এমন কী উপকার হল?"

"না, না। আরও উপকার আছে বন্ধু। ওই যে মুরগির ডিমের সাইজের মুক্তো, আর কাকের ডিমের মতো কালো হিরে। সেও তো ওঁদেরই দান।"

"তখন থেকে কাকের ডিম, কাকের ডিম করছিস কেন? কাকের ডিম কি কালো হয়? আর হিরে কালো মানে তো কয়লা। দুটোই কার্বন," আমি বিদ্যে ফলাই।

"কাকের ডিম কেমন রং-এর হয় জানি না। একবার কাকের ছানা পাড়তে গিয়ে কী ঠোকর খেয়েছিলাম! জীবনে ভুলব না। তবে আমাদের হিরে কালো। মানে, দারুণ দেখতে হিরে। ভিতরে কালো বাইরে সাদা। না দেখলে পেত্যয় যাবি না।"

"যাই হোক। সে হিরে-মুক্তো আছে কোথাও লুকনো। তবে আমরা দেখিনি। কিন্তু তা যে ওই একবাক্স ভূতের দান, তা আমরা জানি।"

"শুনি সেই গপ্পো।"

"গপ্পো নয়। সত্যি। এ আমার ঠাকুরদার বাবার কাহিনি। শ্রী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত যখন গত হলেন, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভ্যাবা ওরফে কৈতবানন্দ প্রাতিভাসিক স্কুলের গণ্ডিও পার হননি। বাপ মারা যাওয়ায় হঠাৎ ওই বিপুল সম্পত্তি হাতে আসায় বিদ্যাশিক্ষা আর তাঁর হল না। বরং অবিদ্যার শিক্ষাই বেশি হল। স্বামীর অমন অপমৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করায় শ্রীমতী কৌমুদীপ্রকাশনী আর ছেলের কোনও ইচ্ছেতেই বাদ সাধতেন না। ফলে ছেলে অর্থাৎ কৈতবানন্দ ওরফে ভ্যাবা হয়ে উঠলেন ভ্যাবাডাকাত। দিনের বেলা জমিদার, রাতের বেলা ডাকাত। ভাল লাঠি খেলতে পারতেন। সুতরাং শাগরেদও ছিল অনেক।

"মাঝে-মাঝেই রাতে মুখে কালিঝুলি মেখে নকল গালপাট্টা আর গোঁফ লাগিয়ে মাথায় লাল শালু বেঁধে দলবল নিয়ে ভ্যাবা ডাকাতি করতে বের হতেন।"

"সে কী রে? তোর পূর্বপুরুষ ডাকাত ছিলেন?"

"নয়তো কী? এত সম্পত্তি হল কী করে শুনি?"

"তা নকল গোঁফ লাগাতেন কেন?"

"বাঃ, নইলে সবাই চিনে ফেলবে না? জমিদার কৈতবানন্দ প্রাতিভাসিক ভট্টোপাধ্যায় ডাকাতি করলে, ইংরেজ পুলিশ ধরে গারদে পুরে দেবে না? যাকগে, যা বলছিলাম, শোন।

"ভ্যাবা যেমন ডাকাত ছিলেন, তেমনই আমাদের পাশের গাঁয়ের যিনি জমিদার ছিলেন, সংযুক্তশেখর, তিনিও ছিলেন ডাকাত। কিন্তু তাঁদের দু'জনেরই এমন গোপনীয়তা ছিল যে, কেউ অন্যের খবর রাখতেন না। এখন তো এটা প্রায় আধা শহর, তবু পশ্চিম দিকে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে একটু এগোলে দেখবি বিশাল এক আমবাগান, এখন অবশ্য অর্ধেকও নেই। তাতেই অত বিরাট। তা হলে গোড়ায় কী ছিল ভাব।

"তা এই আমবাগানের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সংযুক্তশেখরের জমিদারিতে বা তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা। এটাই মূল রাস্তা। আবার ঠিক এর বিপরীত দিকে মানে শহরের বাঁ দিক দিয়ে ওই একই দিকে ঠিক একই রকম একটা রাস্তা চলে গেছে। প্রথমটাকে বলে 'আমবাগানের পথ'। পরেরটার নাম 'জামবাগানের পথ'। কেন জামবাগান বলে, তা বলতে পারব না। কারণ জামগাছ দু'-দশটার বেশি নেই। বোধ হয়, আমবাগানের সঙ্গে মিলিয়ে জামবাগান বলা হয়।

"যাই হোক, আমার ঠাকুরদার পিতা শ্রী ভ্যাবা বা কৈতবানন্দ একবার ঠিক করলেন, সংযুক্তশেখরের বাড়িতে ডাকাতি করবেন। ঠিক হল পরের অমাবস্যার রাতে এ-কাজ সমাধা করা হবে। এ-ব্যাপারে যারা মূল পরামর্শদাতা, তারা হল ওই বাক্সের ভূতগুলো। দিনরাত কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর।

" 'ভ্যাবা রে, ওদের কত টাকা হয়েছে খোঁজ রাখিস? সোনাদানা, হিরে-জহরত উপচে পড়ছে। ওদের বাড়িতে নাকি মুরগির ডিমের সাইজের মুক্তো আছে। আর কাকের ডিমের সাইজের কালো-কালো হিরে। পাশে থেকে এসব কী করে সহ্য করছিস রে ভ্যাবা,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

"শেষে ভ্যাবা ঠিক করলেন, নাঃ, পরের অমাবস্যাতেই কাম ফতে করতে হবে। আর, যেমন ভাবা তেমনই কাজ। অমাবস্যার রাতে ভ্যাবার দল কালিঝুলি মেখে, বাঁদুরে টুপি পরে, আর মাথায় লাল শালু বেঁধে আমবাগান থেকে রওনা দিল পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ির দিকে।

"এদিকে ঠিক ওই দিনেই সংযুক্তশেখর ওরফে খপা ডাকাতের দলও সেই একইরকমভাবে সেজেগুজে রওনা দিল জামবনের মধ্যে দিয়ে ভ্যাবার বাড়ির দিকে।

"মধ্যরাতে দু'বাড়িতেই ডাকাত পড়ল। আমার ঠাকুরদার মা ছিলেন বড্ড ভালমানুষ। কিন্তু তাঁর ছিল অসীম সাহস। ডাকাত পড়তেই, সিন্দুক খুলে সব গয়নাগাটি বের করে নিজের অঙ্গে পরে নিলেন। যা পরতে পারলেন না, তা থলে করে কোমরে বেঁধে নিলেন।

"সব নিয়ে ওই যে আমাদের রান্নাঘরের পিছনে পুকুরটা দেখিস, সেটা তখন ছিল দিঘি, তার জলে গিয়ে ডুব মারলেন। যাবার আগে সঙ্গে নিলেন, এই ভূতের বাক্সটা আর পাটকাঠি।"

"কেন?"

"বাঃ, ভূতের বাক্স না নিলে ওরা বলে দেবে না খপা ডাকাতদের, কোথায় আছে গয়নাগাটি।"

"আর পাটকাঠি?"

"জলের ভিতর ডুবে নিশ্বাস নিতে হবে না? তখনকার দিনে তো আর ডুবুরির পোশাক ছিল না। লোকে পাটকাঠি দিয়েই দম নিত।

"খপা ডাকাতরা বাড়ি তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কিছু



বাক্সভর্তি ভূত

কাঁসার, পেতলের বাসন ছাড়া আর কিছু পেল না। রাগের চোটে গোয়াল থেকে গোরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গোয়ালে আগুন ধরিয়ে চলে গেল আমবাগানের পথ ধরে।

"ওদিকে ভ্যাবার তো সব জানাই ছিল, মুরগির ডিমের মতো হিরে আর অসংখ্য সোনাদানা নিয়ে তারা ফিরে এল জামবাগানের মধ্যে দিয়ে। কারও সঙ্গে কারও দেখা হল না।

"আমার ঠাকুরদার মা মানদাদেবী জলের ভিতর বাক্সটা রেখে দিয়ে গয়নাগাটি নিয়ে উঠে এলেন। সারা রাত হইচই, লোকজন। সকাল হলে দেখা গেল বাক্সটা যেখানে থাকার সেখানেই আছে।

"শুধু তাই নয়, মানদাসুন্দরী একটু একা হতেই সেই খোনা গলায় কে বলে উঠল, 'এঁ-কাঁজটা কিঁন্তু ঠিঁক কঁরলি নাঁ মাঁনু।'

" 'কোন কাজটা?' তিনি অবাক।

" 'ওঁই যেঁ গঁয়না নিঁয়ে পাঁলানো, জঁলে ডুঁব দেঁওয়া।'

" 'তবে রে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। এই কে আছিস, ডাক তো মার্তণ্ড ওঝাকে।'

"ব্যস সব চুপ। তখনকার দিনে মার্তণ্ডকে ভয় পেত না এমন ভূত ভূ-ভারতে ছিল না। তাই সেই থেকে আমাদের বাড়িতে কোনও পেতলের, কাঁসার বাসন পাবি না। সব স্টেনলেস।"

"ধ্যাত, তখনকার দিনে স্টেনলেস ছিল নাকি?"

"না, তখন ছিল সব কাচের বাসন। এখন স্টেনলেসের।

"যাই হোক। বাক্সটা দেখে আমার খুব লোভ হল বুঝলি। খুব ইচ্ছে হল তোদের সবাইকে এনে দেখাই।" রিন্টুল বলল।

"আনলি না কেন?" আমরা জিজ্ঞেস করি।

"চাইলাম তো! বললাম, 'ভাই ফটকে, দে না বাক্সটা। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের দেখাব।'

"তা ফটকে বলল, 'নিবি তো। রাখতে পারবি? বাক্স ঠিক আমাদের বাড়ি ফিরে আসবে।'

"কেমন রোখ চেপে গেল। বললাম, 'পারি কি না দেখবি? দিয়ে দ্যাখ।'

"বলল, 'না রে পারবি না রাখতে।'

"বললাম, 'বাজি?'

" 'হ্যাঁ। বাজি।'

" 'কত?'

" 'দশ টাকা।'

" 'দে তবে দশ টাকা।'

" 'বাঃ। আগে বাজি জিতি, তবে তো।'

" 'বাঃ। তুই নিয়ে চলে যাবি। তারপর সত্যিই বাক্স ফিরে এলে তোকে কোথায় পাব? তার চেয়ে দশ টাকা দিয়ে বাক্স নিয়ে যা। ধরে রাখতে পারলে পরের বার এসে বাক্স ফেরত দিয়ে কুড়ি টাকা নিয়ে যাবি। দশ টাকা তো আর মার যাচ্ছে না। বরং দশ টাকা জমা রইল।'

"বাক্স হাতে করে ফিরে এলাম মামাবাড়ি। একটু যে ভয়-ভয় করছিল না, তা নয়। হাজার হোক, ভূতের বাক্স তো।

"মামাবাড়ি এনে, ওটা আমার খাটের উপর বালিশের পাশে রেখেছিলাম। দু'-একবার চেষ্টাও করলাম খুলতে। কিন্তু নাঃ। কিছুতেই খোলা গেল না। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চাপটাপও দিলাম। হল না। হাতুড়ি মারা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। এমন সময় বড় মামা ঘরে এসে হাজির।

" 'কী করছিস রে?'

"আমি বাক্সটা লুকনোর চেষ্টা করি, 'না কিছু না।'

" 'কিছু না কী রে? ও কী? এ বাক্স তুই কোথায় পেলি?'

"ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে এল। ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'ফটিক দিয়েছে।'

" 'তাই বল। ফটকে দিয়েছে। এটা তো আমিই ওকে দিয়েছি। আমার গাড়িতে ছিল। ওর চাবিটা কোথায় হারিয়েছে। খুলতে পারছিলাম না। তা, ফটকে বলল, 'মামা, ওটা নেব?' আমার আর কী কাজ হবে। তাই দিয়ে দিলাম।'

"তা তোকে দিয়ে দিল যে বড়? ওটা নিয়ে ঝগড়া করেছিস নাকি? মামার সম্পত্তি বলে?"

"আমার তখন আস্তে-আস্তে রাগ চড়ছে। আমি আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কাজে লাগত ওটা?'

" 'দেখিসনি কলকাতায়? ওতে ঘাম মোছার জন্য পেপার-ন্যাপকিন থাকে। এমনি পাইন কাঠের। উপরে স্টেনলেসের কাজ করা। বেশ দেখতে, না?'

"বড় মামা বের হয়ে গেলেন। আমার রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। সারা শরীরে জ্বালা ধরে গেল। বাক্সটা নিয়ে আবার এক ছুট। মামি পিছন থেকে হাঁক পাড়লেন, 'আরে রিন্টুল। কী হল? কোথায় ছুটলি এই রাত্রিবেলা? কোথায় সাপখোপ আছে।'

"কে শোনে কার কথা!

" 'কাকিমা, ফটকে কোথায়?'

" 'ওঃ, রিন্টুল? আবার কোথা থেকে এলি? ওই তো ফটকেও তোর পিছন-পিছন বের হল। লাইব্রেরির বই পালটাতে না কী যেন বলল।'

"অত কথা শোনার আমার ধৈর্য নেই। একছুটে গেলাম ওর দোতলার ঘরে। ছুড়ে ফেলে দিলাম বাক্সটা ওর খাটের উপর। দশ টাকা গেছে যাক। ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। মিথ্যেবাদী। জোচ্চোর।

"রেগেমেগে ঘর থেকে বের হয়ে আসছি। ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'অঁত জোঁরে ফেঁললে? লাঁগে নাঁ?'

"সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। কই, কেউ কোথাও নেই। বাক্সটা খাটের উপর তেমনই আছে। আবার বের হতে যাচ্ছি। দরজাটা পার হয়েছি কী হইনি, আবার পরিষ্কার শুনতে পেলাম, 'কীঁ হঁল? কেঁমন দিঁলাম?'

"আবার চট করে ঘুরে দাঁড়ালাম, বাক্সটা খাটের উপর নেই। ঘর একদম ফাঁকা। ধড়াস করে উঠল বুকটা। এক ছুটে নীচে নেমে দৌড় লাগালাম বাড়ির দিকে।

"দোতলা থেকে ছুটে নামবার সময় মনে হল ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে আমারই মতো কে যেন নামছে। ওটা কি ফটকে?"

ছবি: কৌশিক কুণ্ডু



গা ছমছম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, "না হে, তোমার সাহস আছে। তা কী দেখলে সেখানে?" পাঁচু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়। কয়েকটা লোহার বাক্স আছে মনে হল, তাতে বড়-বড় তালা ঝুলছে।"

"সে তো গুপ্তধন। তোমার লোভ হল না?"

"নাঃ। সনাতনদাদুর দশা দেখে আমার লোভ উবে গেল। মরার ইচ্ছেও চলে গেল।"

"এখনও কি সনাতনদাদুর কাছে যাও?"

"যাই মাঝে-মাঝে। সাতদিন ঘুমোয়, সপ্তাহে একদিন মোটে বেরোয়। গায়ে একটু রোদটোদ লাগিয়ে ফের ঢুকে যায়।"

"তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে, তোমার সনাতনদাদু আসলে ভূত?"

পাঁচু ফের ঠোঁট উলটে বলল, "তাতে কী? ভূত কি আর মানুষ নয়? অত দূরেই বা যেতে হবে কেন, এই তো



হোথায় তেঁতুলতলার বটগাছে বটেশ্বর থাকে। শীতলামন্দিরের পিছনে থাকে কলসি-কানাই, শ্মশানের কালীমন্দিরের পিছনে থাকে দেড়েল-রঘু।"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, "এদের সঙ্গেও তোমার ভাব আছে নাকি?"

"নাঃ। বক্কেশ্বর খুব ভিতু আর লাজুক। কলসি-কানাইকে নাকি কোন সাধুবাবা বলেছিল, তিন লক্ষ তিন হাজার তিনশো তিনটে সুচে সুতো পরাতে পারলেই নাকি সে যা চাইবে তাই পাবে। শুনেছি, কানাই নাকি মোট তিন হাজার সুচে সুতো পরাতে পেরেছিল। তারপরেই একদিন বউয়ের সঙ্গে ওই সুচে সুতো পরানো নিয়েই ঝগড়া লেগেছিল তার। ঝগড়া লাগারই কথা। কানাই যা রোজগার করত তার প্রায় সবটাই চলে যেত সুচ আর সুতো কিনতে। সংসারের সব কাজ ফেলে দিন-রাত শুধু সুচে সুতো পরালে কার না বউ রাগ করবে বলো! তা রেগে গিয়েই বউ বলেছিল, 'তোমার কি দড়ি-কলসি জোটে না!' এ-কথায় রেগে গিয়ে কানাই গলায় কলসি বেঁধে ঝিলে গিয়ে ডুব দিল। দিল তো দিলই। এখন সে বাকি সুচগুলোয় সুতো পরিয়ে যাচ্ছে। দম ফেলার ফুরসত নেই।"

"আর দেড়েল-রঘু?"

"ও বাবা! সে মস্ত তান্ত্রিক। সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তবে তারও শুনেছি একটা দুঃখ আছে। বেঁচে থাকতে তার দাড়ি মোট আড়াই হাত লম্বা হয়েছিল। তার খুব শখ ছিল চার হাত দাড়ির। দাড়ি মাটিতে ঘষটে যাবে, লোকে চেয়ে দেখবে, তবে না দাড়ির মহিমা। দাড়ির এমনই নেশা হয়েছিল যে, রঘু যখন সাধনায়

সিদ্ধিলাভ করে কালীর দেখা পেল, আর মাকালী যখন বর দিতে চাইল, তখন রঘু চার হাত দাড়ির বর চেয়েছিল।"

"এঃ হেঃ, মাত্র চার হাত?"

"আপনি তো বলেই খালাস, মাত্র চার হাত! কিন্তু চার হাত দাড়ি নিয়ে বেঁটেখাটো নাটা মানুষ রঘু যে কী মুশকিলে পড়ল তা বলার নয়। দাড়ি মাটিতে ছেঁচড়ে যায়, আর তাতে মাটি ঝাঁটপাট হয় বটে, কিন্তু দাড়িতে উঠে আসে বিস্তর ময়লা, কাঠকুটো, ইঁদুরছানা, আরশোলা, ব্যাঙ, কাঁকড়াবিছে, কেন্নো, পিঁপড়ে। তা ছাড়া বে-খেয়ালে নিজের দাড়িতে পা বেঁধে কত্‌বার আছাড় খেয়েছে তার হিসেব নেই। শেষে সেই দাড়ির জন্যেই তো প্রাণটাও গেল? ধানখেতের আলের রাস্তায় ওই দাড়িতে আটকেই একটা কেউটের বাচ্চা উঠে এসেছিল কিনা। তারপর আর দেখতে হল না।"

"বাঃ, ময়নাগড়ের সব ভূতের বৃত্তান্তই তো তোমার জানা দেখছি।"

"বোকা লোকদের তো ওইটেই সুবিধে। যা দেখে তাই বিশ্বাস করে। লেখাপড়া জানা চালাকচতুর লোকেরা তো তা নয়। ভূত দেখলেও নানা ফ্যাকড়া তুলে, কূটকচালি করে ওটা যে ভূত নয় সেটা প্রমাণ করেই ছাড়বে। কিন্তু আপনি কে বলুন তো! আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না।"

"চেনার কথাও নয় কিনা। আমার নাম হিজিবিজি।"

পাঁচু একটু ভেবে ঘাড় কাত করে বলল, "বাঃ, বেশ নাম! ভুল হওয়ার জো নেই। তা এ-গাঁয়ে কাকে খুঁজছেন?"

"কাউকেই নয়। এ-পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, একটু জিরিয়ে নিতে থেমেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী ভাল লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে, দুটো দিন থেকে যাই।"

ভারী লজ্জা পেয়ে পাঁচু বলে, "যাঃ, কী যে বলেন! আমার সঙ্গে দেখা হলে সবাই তো বিরক্তই হয়। কেউ খুশি হয় না তো। অনেকে তো আমাকে দূর থেকে দেখে দরজা বন্ধ করে দেয়।"

"তা হলে আমিও বোধ হয় তোমার মতোই বোকা লোক, তাই তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে।"

পাঁচু চিন্তিত হয়ে বলে, "তা-ই বা হয় কী করে? আপনাকে দেখে যে বোকা বলে মনেই হয় না। বরং মনে হয়, আপনি ভীষণ চালাক।"

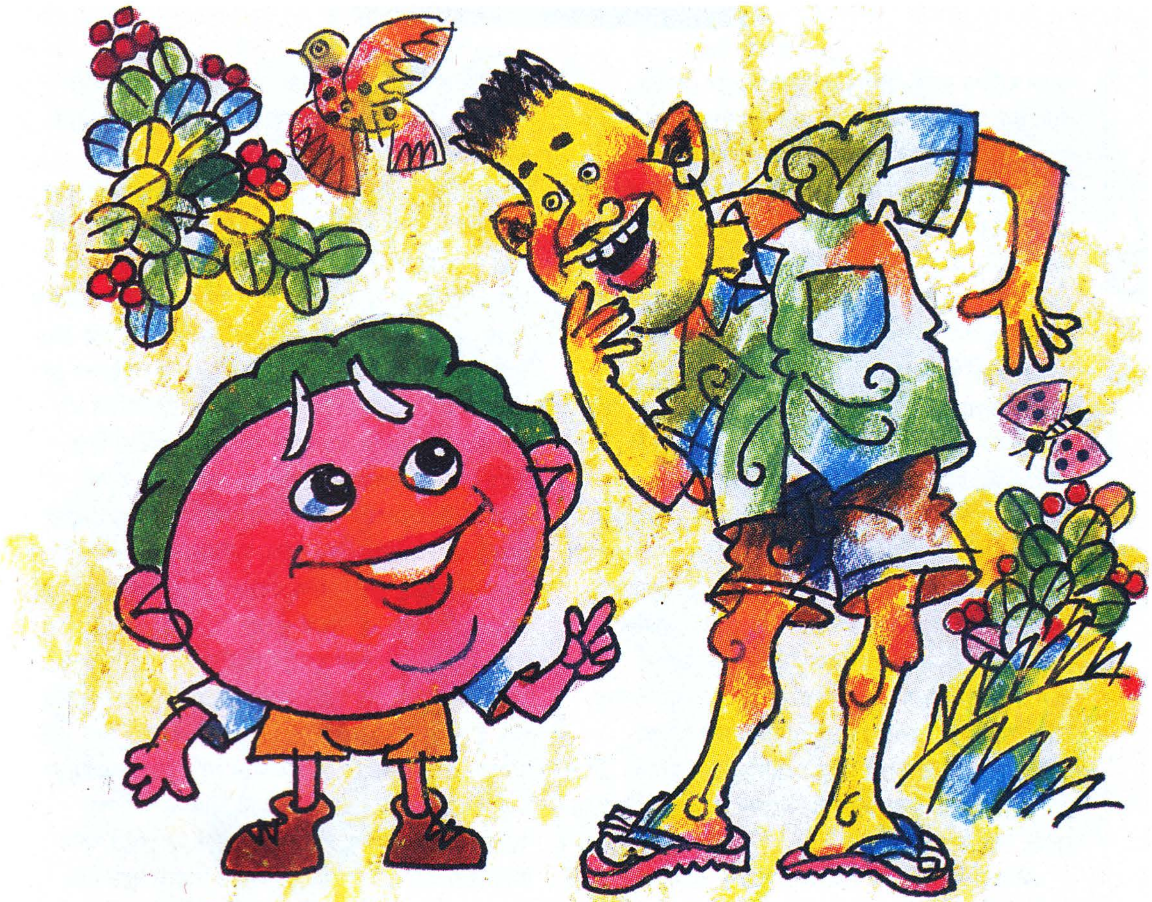
"তা হলে তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি। তুমি কি জানো যে, দুনিয়ায় বোকা লোকের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে? আমি সারা দেশ চষে বেড়াই, আজ অবধি একটা খাঁটি, নীরেট বোকা লোক দেখতে পেলাম না।"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলে, "সে ঠিক কথা। এ-গাঁয়েও আমি ছাড়া আর বোকা লোক নেই।"

"আমি আসলে বোকা লোকই খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ভারী অবাক হয়ে পাঁচু বলে, "বোকা লোক খুঁজছেন কেন?"

"বোকা লোক না হলে আমার কাজ-কারবারের সুবিধে হয় না কিনা। কিন্তু বোকা লোক খুঁজে বের করা ভারী শক্ত। অনেকে বোকা-বোকা ভাব করে থাকে, আসলে খুব চালাক। অনেকে আবার এক বিষয়ে বোকা তো অন্য বিষয়ে চালাক। ধরো ইংরিজিতে বোকা, অঙ্কে চালাক। আবার অনেকে আছে এত বেশি চালাক যে, চালাক লোকেরা তাদের চালাকি ধরতে না পেরে বোকা বলে ভেবে নেয়। তা



তুমি এদের মতো নও তো!"

মাথা নেড়ে পাঁচু বলে, "তা তো জানি না। অত জানলে তো চালাকই হতাম।"

হিজিবিজি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কাজটা খুব শক্ত।"

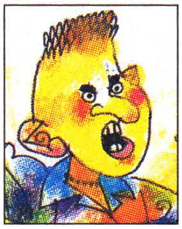
পাঁচু বলে, "কোন কাজটা?"

"সত্যিকারের বোকা কিনা তা বুঝতে পারা। তোমাকে আরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"ও বাবা, খাতা-কলম নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে নাকি? সে কিন্তু আমি পারব না। " বলেই পাঁচু অবাক হয়ে দ্যাখে, লোকটা আর তার পাশে নেই। চারদিকে চেয়ে কোথাও হিজিবিজিকে দেখতে পেল না পাঁচু। লোকটা স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

লোকে বলে, "চোরেক্কে চোর, চোর দু' গুনে টকাই।" তা কথাটা মিথ্যে নয়। টকাইকে শুধু চোর বললে গুণী মানুষের অমর্যাদা হয়। এই যেমন কেতুগাঁয়ের হরমন ওস্তাগর। সে কি শুধু দরজি? তা হলে তার হাতের তৈরি পায়জামা পরে রাস্তায় বেরোলে চারদিকে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় কেন? আর কেনই বা "কেয়াবাত কেয়াবাত" ধ্বনি শোনা যায়, মাঝের গাঁয়ের নটবর অতি সুপুরুষ। বিয়ে করতে গেল হরমনের তৈরি পাঞ্জাবি পরে। তা বিয়েবাড়িতে বরকে দেখে বরের পাঞ্জাবির প্রশংসায় লোকে এমন শোরগোল তুলে ফেলল যে, নটবর বিয়ে না করেই ফেরত এসেছিল। শুধু কি তাই? হরমনের তৈরি হাফ পেন্টুল পরে কালীপুরের বিখ্যাত কাপুরুষ অভয়পদ অবধি একদিন দিব্যি নিশিদারোগার চোখে চোখ রেখে বুক ফুলিয়ে কথা কয়ে এল। পরে অবশ্য ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা মনে পড়ায় সে ভিরমি খায়। গুণী মানুষের অভাব নেই এ-তল্লাটে। ওই যে খয়রাপোতার ফকির জোলা, রোগাভোগা বুড়ো মানুষ, ক্ষয়াটে চেহারা, রুক্ষ দাড়ি আর পাকা চুলে তেমন আহামরি কেউ বলে মনেও হয় না। ঘরে কেঠো তাঁতে গামছা আর লুঙ্গি বানিয়ে বুড়ো হল। তার ওইসব লুঙ্গি আর গামছার জন্য বছরখানেক আগে থেকে আগাম দাম দিয়ে নাম লিখিয়ে রাখতে হয়। হাটের জিনিস তো নয় যে, পয়সা ফেললেই পাওয়া যাবে। ফকিরের লুঙ্গি আর গামছার সমঝদার সব নবাব-বাদশা গোছের লোক। হিল্লি-দিল্লি থেকে লোক এসে মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে যায়। এ-তল্লাটের লোক সে জিনিস চোখেও দেখতে পায় না। তবে বিক্রমগড়ের রানিমার জন্য একখানা বেনারসী বুনে দিয়েছিল ফকির। মাঘী পূর্ণিমার স্নানের দিন বেনারসীখানা পরে হাতিতে চেপে চানে যাচ্ছিলেন রানিমা। তা বেনারসীটা



গা ছমছম

দেখে হাতিও নাকি সেলাম দিয়েছিল। পরে লোকে বলেছিল, "রানি না রামধনু তা যেন ভাল করে বোঝাই গেল না, আহা কী রং! কী জেল্লা! চোখ সার্থক।" আর তায়েবগঞ্জের মানুষখেকো বাঘের গপ্পো তো সবাই জানে। তায়েরগঞ্জের ধার ঘেঁষে খয়রাপোতার গভীর জঙ্গলের ধারে মতি পাড়ুই হারানো ছাগল দুখিয়াকে খুজঁতে গিয়ে পড়ে গেল বাঘের খপ্পরে। মতি মনের দুঃখে দুখিয়াকে ডাকতে-ডাকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কাঁধে এসে পড়ল বিশাল একখানা থাবা। একটি থাবায় তাকে মাটিতে ফেলে বাঘ বেশ করে দিনান্তে জলযোগ সেরে নিতে সবে হাঁ করেছে, ঠিক সেই সময়েই সন্ধের মুখে একটু দূরে নিজের একটেরে ঘরটিতে বসে তমিজ মিয়া পূরবীতে তান ধরলেন। বাস, বাঘ আর কামড় বসাতেই পারল না। খানিকক্ষণ উদাস নয়নে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। হিংস্র বাঘ হয়ে গেল স্বপ্নাতুর, থাবার নখ লুকিয়ে ফেলে সেই থাবা দিয়েই চোখের জল মুছতে-মুছতে ধীর পায়ে জঙ্গলে ফিরে গেল। একদিন গভীর রাতে তমিজ মিয়া দরবারি কানাড়ায় আলাপ ধরেছেন, সেইসময়ে তাঁর বাড়ির সামনে গালপাট্টাওয়ালা, জরির সাজ পরা একটা লোককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে গাঁয়ের চৌকিদার রামলাখন চৌবে গিয়ে লোকটাকে চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "ক্যা রে চোট্টা, ক্যা মতলব?"

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "চোপ, এখন গন্ডগোল কোরো না, আমি মিয়া তানসেন, তমিজের গান শুনতে চলে এসেছি।" সেই কথা শুনে রামলাখনের দাঁতকপাটি লেগেছিল।

কথাটা হল, এইসব গুণী মানুষের পাশাপাশি টকাইকেও ধরতে হয়। ওরে বাপু, গাঁ-দেশে চোরের অভাব কী? তবে সেইসব নিঘিন্নে চোরেদের দলে তো আর টকাইকে ফেলা যায় না। ছা-পোষা গেরস্তদের ঘরে সে কখনও পায়ের ধুলো দেয়নি। নজর সর্বদা উঁচু। লাখপতি, কোটিপতি ছাড়া তার রোচে না। তার গুণের কথা না বললে অধর্ম হবে। কাউকে সে সর্বস্বান্ত করে আসে না। লাখ টাকার নাগাল পেলেও সে অর্ধেকটা ছেড়ে অর্ধেকটা নেয়। কারও বাড়িতে আবার পরদিনের বাজার-খরচ রেখে আসে।

গোবরদহের মহেন্দ্র সৎচাষির বিশটি হাজার টাকা সে লোপাট করেছিল বটে, কিন্তু তার খোকাখুকুর জন্য রঙিন পোশাক, খেলনা আর তার বউয়ের জন্য দামি শাড়ি রেখে এসেছিল।

লোকে তাই পঞ্চমুখে বলে, "হ্যাঁ, টকাই সহবত জানে বটে!"

প্রতাপপুরের নকুল প্রতিহার সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় নিজের বাড়ির চুরির গল্প ফেঁদে বলল, "যাই বলো, এমন চোরের কাছে বোকা বনেও সুখ। কী বলব ভাই, দরজায় ভিতর থেকে লোহার বাটাম দেওয়া, তালা মারা, তার উপর আমার সজাগ ঘুম। শেষরাত্রে দেখি, দরজা যেমনকে তেমন বন্ধ আছে। পাশের দরজাটাও দেখলাম আঁট করে সাঁটা, বাথরুম ঘুরে এসে জল খেয়ে শুতে যেতেই হঠাৎ খটকাটা লাগল। আচ্ছা, আমার সদর দরজা তো একটা! তবে দুটো দরজা দেখলাম কেন? তাড়াতাড়ি উঠে বাতি জ্বেলে দেখি, কী বলব ভাই, দেওয়াল কেটে রাতারাতি কে যেন ভারী যত্ন করে দু'নম্বর দরজাটা বানিয়ে গেছে। তখন চৈতন্য হল, তাই তো, খালধারের জমি বেচে লাখদুই টাকা পেয়ে লোহার আলমারিতে রেখেছিলাম যে! তা দেখলাম, আলমারিটাই নেই। অবশ্য তার বদলে ঝাঁ-চকচকে একটা নতুন আলমারি কেউ দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে লাখখানেক টাকা যত্ন করে রাখা আছে। আমার বউয়ের চল্লিশ ভরি গয়না নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়ের জন্য গড়ানো গয়নাগুলো সাজিয়ে রেখে গেছে। রাগ করব কী মশাই, চোখে জল এল।কই হে পোদ্দার, তোমার সেই গল্পটা বলো না, সবাই শুনুক।"

বিরিঞ্চি পোদ্দার মুখ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে বলল, "ওঃ, সে এক কাণ্ডই বটে। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ হচ্ছে শুনে ধড়মড় করে উঠে দেখি, পাশের ঘরে তিন-চারজন জটাজূটধারী সাধু মাঝখানে ধুনি জ্বেলে একমনে যজ্ঞ করছে। দেখে তো আমি আর গিন্নি ভ্যাবাচ্যাকা। অশৈলী কাণ্ড যাকে বলে! কিছুই বুঝতে না পেরে আমি আর গিন্নি গুটিগুটি গিয়ে জোড়হাতে পিছনে বসে যজ্ঞ দেখতে লাগলাম। বলব কী ভাই, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রে নিখুঁত যজ্ঞ। দেখলে পাষণ্ডেরও ভক্তিভাব এসে পড়ে। তা ঘণ্টাখানেক মুগ্ধ হয়ে যজ্ঞ দেখলাম। তারপর বড় সাধু আমার দিকে ফিরে বলল, "অবাক হচ্ছিস যে ব্যাটা! এই সাড়ে তিনশো বছর বয়সে হিমালয় থেকে এতদূর ঠেঙিয়ে কি এমনি এসেছি রে আহাম্মক! তোর রিষ্টি কাটাব বলেই আসা। নে, যজ্ঞের তিলক কপালে সেঁটে এবার নিশ্চিন্তে ঘুমো। রিষ্টি কেটে গেছে।"

আমি খুঁতখুঁত করে বললাম, "যজ্ঞ করলেন, সে তো খুব ভাল কথা! কিন্তু একটু ডাকলেও তো পারতেন, দরজা খুলে দিতুম।"

সাধু অট্টহাসি হেসে বলে, "কোনও দরজা কি আমাদের আটকাতে পারে রে বোকা! সূক্ষ্ম দেহে সর্বত্র যাতায়াত। ডাকাডাকি করে পাড়াসুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙানো কি ভাল রে বদ্ধ জীব? তা হলে যে সবাই টানাহ্যাচঁড়া করে তাদের বাড়িতে নেওয়ার চেষ্টা করত। এবারটায় শুধু তোর জন্যই আসা কিনা!"

তা সেই কথা শুনে কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে গেলাম, মাথাটা কাজ করছিল না। গিন্নি তো কেঁদেকেটে একশা। ধাঁ করে একশো এক টাকা প্রণামী দিয়ে ফেলল। তা সাধুরা প্রণামী ছুঁলও না। বড়সাধু বলল, "টাকাপয়সা নোংরা জিনিস। ওসব আমরা ছুঁই না।" গিন্নি তখন হাতের দু'গাছা



বালা খুলে দিয়ে বলল, "না নিলে গলায় দড়ি দেব বাবা।"

সাধু নাকটাক কুঁচকে চেলাদের বলল, "নে, তুলে নে। গরিব-দুঃখীর কাজে লাগাস।" তারপর তারা বিদায় হল। পরদিন সকালে দেখি, আলমারি আর বাক্স-প্যাঁটরা সব ফাঁক। ও চোর শুধু চুরি করতেই আসে না রে ভাই, শিক্ষেও দিতে আসে।"

সবাই একমত হয়ে বলল, "তা বটে!"

তা টকাইয়ের নামডাক আছে বটে, কিন্তু ইদানীং তার কেমন যেন একটু বৈরাগ্য এসেছে। সারাদিন ক্ষণে-ক্ষণে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে আর মাঝে-মাঝে হাহাকার করে ওঠে, "ওঃ বড় পাপ হয়ে গেল রে।"

তার চেলাচামুণ্ডার অভাব নেই। চেলাদের মধ্যে নবা হল তার একেবারে ছায়া। সর্বদা সঙ্গে সেঁটে আছে। সেবাটেবাও করে খুব। তা টকাইয়ের এসব লক্ষণ তার মোটেই ভাল ঠেকছে না।

বেড়ে বিষ্টুপুরের মহাজন হরমোহন পালের গদিতে হানা দিয়েছিল টকাই। গেল হপ্তার রোববারের ঘটনা। চারখানা জাম্বুবান তালা চোখের পলকে খুলে ফেলল। ভিতরে ঢুকে মজবুত লোহার সিন্দুকের গায়ে মোলায়েম করে হাত বোলাল, আর তাইতেই সিন্দুকের ভারী পাল্লাটাও যেন অবাক হয়ে হাঁ করে ফেলল। ভিতরে না হোক বন্ধকি গয়না আর মোহর আর রুপোর জিনিস মিলিয়ে তিন-চার লাখ টাকার মাল। টকাই তবু শেষ মুহূর্তে হাত গুটিয়ে নিয়ে বলল, "এসব করা কি ঠিক হচ্ছে রে। লোকে কত খেটেপিটে রোজগার করে, কত কষ্টে এক পয়সা দু'পয়সা করে জমায়। আর আমি পাষণ্ড সেসব লেপেপুঁছে নিয়ে আসি। এ কি ভাল? এসব পাপের কি ক্ষয় আছে? সাত বছর গঙ্গায় ডুবে থাকলে বা সাত হাজার ব্রাহ্মণভোজন করালেও গা থেকে পাপের গন্ধ যাবে না। মরার পর যমরাজা হয়তো আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বলবেন, "ওরে বাপ, এই ঘোর পাপীটাকে নরকে দিলে যে নরকও অপবিত্র হয়ে যাবে।"

নবা জানে, ওস্তাদের আজকাল বড় অনুতাপ যাচ্ছে। সাবধানে কথা কইতে হয়। সে মোলায়েম গলায় ফিসফিস করে বলল, "আজ্ঞে, আপনি জ্ঞানী মানুষ, আপনার কথার উপরে তো কথা চলে না। তবে কিনা ওস্তাদ, আমরা কি আর ইচ্ছে করে চুরি করি? আমাদের পেট আর অদৃষ্টই যে এ-লাইনে টেনে আনল, আমাদের দোষ কী বলুন!"

টকাই তবু ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল, "ওটা কোনও যুক্তি নয় রে নবা! অভাব, কষ্ট, পেটের দায় থাকলেই কি আর লোকে চুরি করে? তা হলে তো ভিতরে-ভিতরে আমি দন্ধে



গা ছমছম

মরে মরি যাচ্ছি। সোনাদানা, টাকাপয়সায় আমার বড় অরুচি হয়েছে। এখন আমার সাধুসঙ্গ করা দরকার। খোঁজ নে তো, ভাল সাধু কে আছেন কাছেপিঠে। ধর্মকথা না শুনলে আমার মনটা শান্ত হবে না রে।"

ওস্তাদের কথা অমান্যই বা করে কী করে? তাই নবা পরদিন থেকে খুঁজতে শুরু করে তেরাত্তিরের মাথায় খবর আনল, ময়নাগড়ের উত্তরের জঙ্গলে একজন সাধুগোছের লোক আছেন বটে, তাঁর নাম জটাবাবা। জনসমক্ষে বড় একটা বেরোন না। জঙ্গলের মধ্যে কুটির বানিয়ে আপন মনে সাধনভজন নিয়ে থাকেন।

শুনে টকাইয়ের চোখ উজ্জ্বল হল। বলল, "বাঃ, এরকম সাধুই তো চাই।"

টকাইয়ের অগম্য জায়গা নেই। পরদিন সকালেই সে ময়নাগড়ের উত্তরের জঙ্গলে গিয়ে হাজির হয়ে গেল। পেত্নি জলার ধারে ফলসাবন, সেটা পেরিয়ে গহীন জঙ্গল। তার মধ্যে একটা বটগাছের তলায় জটাবাবার কুটির খুঁজে বের করতে বিশেষ কষ্ট হল না টকাইয়ের ।

কুটিরের চেহারা দেখে অবশ্য কুটির বলে বোঝবার উপায় নেই। রাজ্যের ডালপালা, পাতানাতা দিয়ে কোনওরকমে একটা স্তূপাকার জিনিস খাড়া করা হয়েছে। উপরে খেজুরপাতার ছাউনি, কুটিরে ঢোকার একটা ফোকর আছে বটে, তবে দরজা-জানলার বালাই নেই। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, রাজ্যের শুকনো গাছপালা কেউ জড়ো করে রেখেছে। লোকের বাড়িতে রাতবিরেতে ঢোকা টকাইয়ের কাছে জলভাত। কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের ঠেক-এ তো আর ওরকমভাবে ঢোকা যায় না। তাই টকাই বাইরে থেকেই হাত জোড় করে জটাবাবার উদ্দেশে মোলায়েম গলায় বলল, "বাবা!"

ভিতর থেকে প্রথমটায় কোনও সাড়া এল না। গলাখাঁকারি দিয়ে টকাই ফের ডাকল, "বাবা!"

সাড়া নেই। বারপাঁচেক ডাকাডাকির পর ভিতর থেকে একটা বাজখাঁই গলা বলল, "কে তুই?"

"আজ্ঞে, আমি এক পাপিষ্ঠ। আমার নাম টকাই।"

"কী চাস?"

টকাই গদগদ গলায় বলল, "আপনার দয়া চাই বাবা।"

"ভিতরে আয়।"

ফোকরটা দিয়ে সাবধানে বুক ঘষটে ঢুকে পড়ল টকাই, সঙ্গে নবাও।

ভিতরটা অন্ধকার বটে, কিন্তু অন্ধকারেই টকাইয়ের কাজকারবার বলে সে সবই স্পষ্ট দেখতে পেল। একটা কম্বলে ঢাকা উঁচু বেদির মতো আসনে জটাজূটধারী লম্বাটে রোগা চেহারার বেশ তেজস্বী একজন মানুষ বসে আছেন। দাড়িগোঁফ কালোই বটে, তবুও বয়স হয়েছে বোঝা যায়। এই শীতেও খালি গা, তাতে ছাইমাখা। পাশে চিমটে, কমণ্ডলু, বেদির একপাশে বৌলওলা খড়ম। সামনে ধুনি জ্বলছিল, তবে এখন মিইয়ে গিয়ে ধিকিধিকি ছাইচাপা একটু আগুনের আভাস দেখা যাচ্ছে মাত্র। ধুনির বাঁ ধারে একটা লম্বাপানা ফরসামতো ছোকরা বসে আছে। তবে তাকে সাধুর চেলা বলে মনে হয় না। তার গায়ে ঢোলা পোশাক, একটা বাদ্যযন্ত্র আর একটা পোঁটলা।

জটাবাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে টকাই আর নবা ঠান্ডা ভেজা-ভেজা মাটিতেই বসে পড়ল।

জটাবাবা মিটমিট করে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "সঙ্গে ওটি কে?"

জোড়হাতে টকাই বলল, "আর-এক পাপিষ্ঠ, আমার সাঙাত নবা।"

জটাবাবা মজবুত সাদা দাঁত দেখিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "কী পাপ করেছিস বল তো?"

"আজ্ঞে, আমি চোর।"

জটাবাবা যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন, একটু ভেবে বললেন, "তা চুরি করা কি পাপ?"

"পাপ নয়! বলেন কী মহারাজ? চুরি করা তো ভয়ংকর পাপ বলেই জানি।"

জটাবাবা যেন আরও চিন্তিত হয়ে বললেন, "সে তো শুনলাম, কিন্তু কোন আইনে পাপ হচ্ছে সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। ওরে বাপু হিজিবিজি, তুই জানিস?"

যে ছেলেটা ধুনির পাশে বসেছিল সে হাতে একটা চৌকোমতো ক্যালকুলেটর গোছের যন্ত্রে কী যেন দেখছিল। অখণ্ড মনোযোগ।

এ কথায় জবাব দিল না, একটুক্ষণ হাতের যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থেকে তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না, জানি না।"

ফাঁপরে পড়ে টকাই বলল, "চুরি করা তো সবাই পাপ বলেই জানে।"

জটাবাবা ভাবিত মুখে বললেন, "তা জানলেই তো হবে না। দুনিয়ার সব জিনিসই ভগবানের সৃষ্টি, নাকি রে?"

"আজ্ঞে, সে তো ঠিকই।"

"তুইও ভগবানেরই সৃষ্ট জীব।"

"যে আজ্ঞে, তাই তো হওয়ার কথা।"

"তা হলে ভগবানের যা কিছু সৃষ্টি, সবতাতেই তোর হক আছে। তা হলে অন্যের জিনিস বলে তো কিছু নেই। সবই তোর এবং সবার। তা হলে চুরিকে পাপ বলি কী করে?"

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নড়েচড়ে বসে টকাই বলল, "তা হলে কি চুরি করা পাপ নয় বাবা? লোকে কি ভুল বলে?"

জটাবাবা গভীর চিন্তিত মুখে বলেন, "ওরে দাঁড়া, দাঁড়া! অত হুড়ো দিলে কি হয়? ধর, গাছ থেকে একটা ফল পেড়ে নিলি, সেটাও কি গাছের সম্পত্তি নয়? তা হলে সেও তো চুরি! যদি হিসেব করে বিচার করে দেখিস, তা হলে মানুষের প্রায় সব কাজই তো চুরির খাতেই ধরতে হয়।"

"তা হলে কি আমার পাপ হয়নি বাবা?"

"উঁহু, তাও বলা যাচ্ছে না। আরও ভেবে দেখতে হবে।



গা ছমছম

এই সক্কালবেলায় এসে বড় চিন্তায় ফেলে দিলি বাপ! ওরে বাপু হিজিবিজি, একটু ভেবে দ্যাখ তো, চুরিটাকে পাপের খাতে ধরা যায় কিনা।"

হিজিবিজি নামের ছেলেটা তার হাতের যন্ত্রটা ঝোলায় পুরে টকাইয়ের দিকে চেয়ে বেশ হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "আপনি চুরি করেন বুঝি?"

জটাবাবা যখন একে নেকনজরে দেখেন, তখন ইনিও একজন মহাত্মাই হবেন ভেবে টকাই হাতজোড় করে বলল, "যে আজ্ঞে, নিজের উপর বড় ঘেন্না হচ্ছে আজকাল। তা আপনারা সাধু-মহাত্মা লোক, আপনারা যদি ভেবেচিন্তে একটা নিদান দেন তো প্রাণটা জুড়োয়।"

হিজিবিজি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু আমরা যে একজন ভাল চোরই খুঁজছি। কিন্তু মনের মতো চোরই কি আর পাওয়া যায়? এ পর্যন্ত অনেক বেছেগুছে সাতজনকে বের করেছি বটে। কিন্তু তাদেরও নানা খাঁকতি। কারও হাত চলে তো পা চলে না, কেউ দিনকানা, কেউ ভারী আনমনা, কারও বা ভূতের ভয়। তা আপনি কেমন চোর?"

নবা হঠাৎ ফুঁসে উঠে বলল, "তুমিই বা কেমন লোক হে ছোকরা, টকাই ওস্তাদের মুখের উপর জিজ্ঞেস করছ, কেমন চোর? এ তল্লাটে যার কাছে টকাই ওস্তাদের নাম বলবে, সে-ই জোড়হাত কপালে ঠেকাবে। বলি, টকাই ওস্তাদের নাম শোনোনি, এতদিন কি বিলেতে ছিলে নাকি?"

টকাই বিরক্ত হয়ে নবাকে ধমক দিয়ে বলে, "আঃ, সাধুমানুষের সঙ্গে ওভাবে কথা কইতে আছে? ওঁরা সাধনভজন নিয়ে থাকেন, চুরি-ঠারির খবর রাখবেন কী করে?"

ছেলেটা হঠাৎ চোখ বড়-বড় করে বলল, "ও, আপনিই টকাই ওস্তাদ? তাই বলুন, আপনি তো প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ।"

নবা বুক চিতিয়ে বলল, "তা হলেই বুঝে দ্যাখো বাপু, কার সঙ্গে কথা কইছ! তিন-তিনবার নিখিল ভারত পরস্বাপহরক সমিতির বর্ষসেরা হয়ে সোনার মেডেল পেয়েছেন। রাজ্যস্তরে পাঁচবার চোর-চ্যাম্পিয়ন। দেশের সেরা সম্মান 'তস্কররত্ন' দেওয়ারও তোড়জোড় চলছে। টকাই ওস্তাদের মর্ম তুমি কী বুঝবে হে সেদিনের ছোকরা?"

হিজিবিজি লাজুক একটু হেসে ভারী লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, "ছি ছি, এরকম একজন গুণী মানুষকে চিনতে না পারায় ভারী বেয়াদপি হয়ে গেছে। আমি ছোট ছেলে বলে মাপ করে দিন। মাত্র বারো বছর বয়স, কত কী শেখার বাকি!"

নবা চোখ পিটপিট করে বলল, "কার বারো বছর বয়স?"

"আমার কথাই বলছি।"

"শোনো বাপু, একসময় মালদহে দুশো আমকে একশো বলে ধরা হত। দেদার আম ফলত বলে ওটাই ছিল রেওয়াজ। একশো আম কিনলে একশো আম ফাউ। তা তুমি কত বছরে এক বছর ধরছ?"

ছেলেটা মিষ্টি হেসে বলল, "হিসেব খুব সোজা। আমাদের দেশে আঠারো মাসে বছর কিনা!"

"কেন হে বাপু, তোমাদের আঠারো মাসে বছর কেন? বারো মাসে সুবিধে হচ্ছে না বুঝি!"

"আমাদের বছর বড় গড়িমসি করে ঘোরে যে! তার বড্ড আলিস্যি। তার উপর আপনাদের চেনা তিরিশটি দিন পেরোলেই মাস পুরে যায়। আমাদের কী তা হওয়ার জো আছে? মাস আর পুরোতেই চায় না। গড়াতে-গড়াতে সেই একশো কুড়ি দিনে মাস পূর্ণ হয়।"

চোখ গোল-গোল করে শুনছিল নবা, বলল, "ও বাবা! এ যে একেবারে বোম্বাই মাস হে বাপু! মাসমাইনে পেতে গেরস্তের যে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। একশো কুড়ি দিন মানে কত হপ্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বলো তো?"

"হপ্তা? না মশাই, আমাদের হপ্তা নেই। আমাদের হল দশতা!"

"দশতা জন্মে শুনিনি বাপু, সে আবার কী বস্তু?"

ভারী লজ্জায় মরমে মরে গিয়ে হিজিবিজি বলে, "আপনাদের যেমন সাতদিনে হপ্তা, আমাদের তেমনই দশতা। আমাদের বড় ঢিলাঢালা ব্যাপার মশাই। সকালে সুয্যিঠাকুর উদয় হলেন বটে, কিন্তু তারপর আর নড়তেই চান না। মধ্য গগনে উঠছেন, যেন বেতো রুগি। সকালে আমাদের বারতিনেক প্রাতঃরাশ করতে হয়। মধ্যাহ্নভোজনও কম করে বারতিনেক। নৈশভোজও ধরুন তিন থেকে চারবার।"

"বাপ রে! তবে তো খেয়েই তোমরা ফতুর!"

"তা তো বটেই। কিন্তু কী করা যাবে বলুন! আমাদের যে বাহাত্তর ঘণ্টায় একটা দিন।"

"বলো কী হে?"

"তাও যদি আপনাদের ঘণ্টার মতো চটজলদি ঘণ্টা হত। তা ধরুন, আমাদের ঘণ্টার মাপটাও একটু বেঢপ রকমের। মোট একশো আশি মিনিট।"

"বটে হে!"

"তার উপর আবার এক মিনিটও কী সহজে যায়? দুশো চল্লিশ সেকেন্ড পর মিনিটের কাঁটা নড়ে।"

"বাপ রে! না বাপু, তা হলে তোমার নায্য বারো বছর বয়সই বটে। বরং একটু বেশিই ধরা হচ্ছে। আট কী সাত হলেই যেন মানায়। তা তোমাদের দেশটা কোথায় বলো তো! শুনেছি, বিলেতে নাকি ওরকম সব অশৈলী কাণ্ড হয়। সেখানে কাকের রং সাদা, বিধবাদের একাদশী নেই, শীতকালে আকাশ থেকে কাঠি-বরফ পড়ে।"

(শেষাংশ আগামী সংখ্যায়)

ছবি: সমীর সরকার



আগে চা-কে বলা হত 'ব্রিক টি'

চালসার মঙ্গলবাড়ির চা-বাগান

বাংলায় চা-চাষ খুব তাড়াতাড়ি লাভজনক হয়ে উঠলেও এই শিল্পে বাঙালি উদ্যোগী আসেন অনেক দেরিতে। লিখেছেন অরুণাভ দাস

এখন চা-শিল্পের ঘোর দুর্দিন। এমন অবস্থা কিন্তু চিরকাল ছিল না। বহুকাল ধরে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে পৃথিবীর সব পানীয়কে পিছনে ফেলে রেখেছিল চা। প্রথম চা চাষের উদ্ভব হয়েছিল চিনদেশে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিক থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চিন থেকে ইংল্যান্ডে চা রপ্তানি আরম্ভ করে। ভারতে তাদের শাসন পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ-দেশেও কোম্পানির উদ্যোগে চা আসতে থাকে নিয়মিত। সেকালের চা এখনকার মতো ছিল না। ছিল শক্ত ইটের মতো। তাই বলা হত 'ব্রিক টি'। ভারতে চা চাষ করার চিন্তা প্রথম মাথায় এসেছিল বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর। তিনি এর সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকগুলো খতিয়ে দেখার জন্য ১৮৩৪ সালে এক কমিটি তৈরি করেছিলেন। সেই কমিটির রিপোর্ট দেওয়ার আগেই তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড-এর আমলে ১৮৩৯ সালে অসমে প্রথম চা-বাগান গড়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ১৮৩৫ সালে সিকিমের রাজার কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার উপহার হিসেবে পায় দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল। এখানকার জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। দার্জিলিংয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চা-বাগান তৈরি করতে যিনি প্রথম উদ্যোগ নেন, তিনি হলেন সরকারের প্রথম



ভারত-ভুটান সীমান্তে জিতি চা-বাগান

রেসিডেন্ট ডাঃ ক্যাম্পবেল। হিলস্টেশন হিসেবে দার্জিলিংয়ের সামগ্রিক বিকাশে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। চিন থেকে চায়ের চারা আনিয়ে তিনি নিজের বাগানে রোপণ করেন। সেটা ১৮৪০-৪১ সাল। ডাঃ ক্যাম্পবেলের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে দার্জিলিংয়ে নিযুক্ত সেকালের অন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আধিকারিকও চাষের কাজ শুরু করেন।

তারপর বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ আরম্ভ হয় ১৮৫৬ সাল নাগাদ। ব্যবসার জন্য বাগান গড়ে ওঠে টুকভার এলাকায়। আলুবাড়ি বাগান তৈরি করে কার্শিয়াং অ্যান্ড দার্জিলিং টি কোম্পানি। লেবং-এ বাগান পত্তন করে দার্জিলিং ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক। প্রতি বছর চা-বাগিচার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৬০ সালে পাহাড়ে বাগানের মোট সংখ্যা ছিল ৪০টি। পরিস্থিতি এমনই হয় যে, দার্জিলিং-কার্শিয়াংয়ের পাহাড়ে আর চা-বাগান করার জায়গা ছিল না। এইবার তাই চা চাষের উদ্যোগীদের নজর কাড়ে তরাই অঞ্চল। এতকাল অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, কঠিন রোগের প্রকোপ ও ঘন জঙ্গলের জন্য পাহাড়তলির তরাই ও ডুয়ার্স ছিল উপেক্ষিত। নতুন পরিস্থিতিতে ১৮৬২ সালে তরাইয়ের চাম্পটা নামে এক জায়গায় প্রথম চা-বাগান তৈরি হয়। ১৮৭২ সালে ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রথম চা-বাগান গড়ে ওঠে। ১৮৭৪ সালের সরকারি হিসেব থেকে দেখা যায় যে, তখন বাংলার পাহাড় ও পাহাড়তলি মিলিয়ে ১১৩ টি চা-বাগান ছিল, যার আয়তন ছিল ১৮৮৮৮ একর।

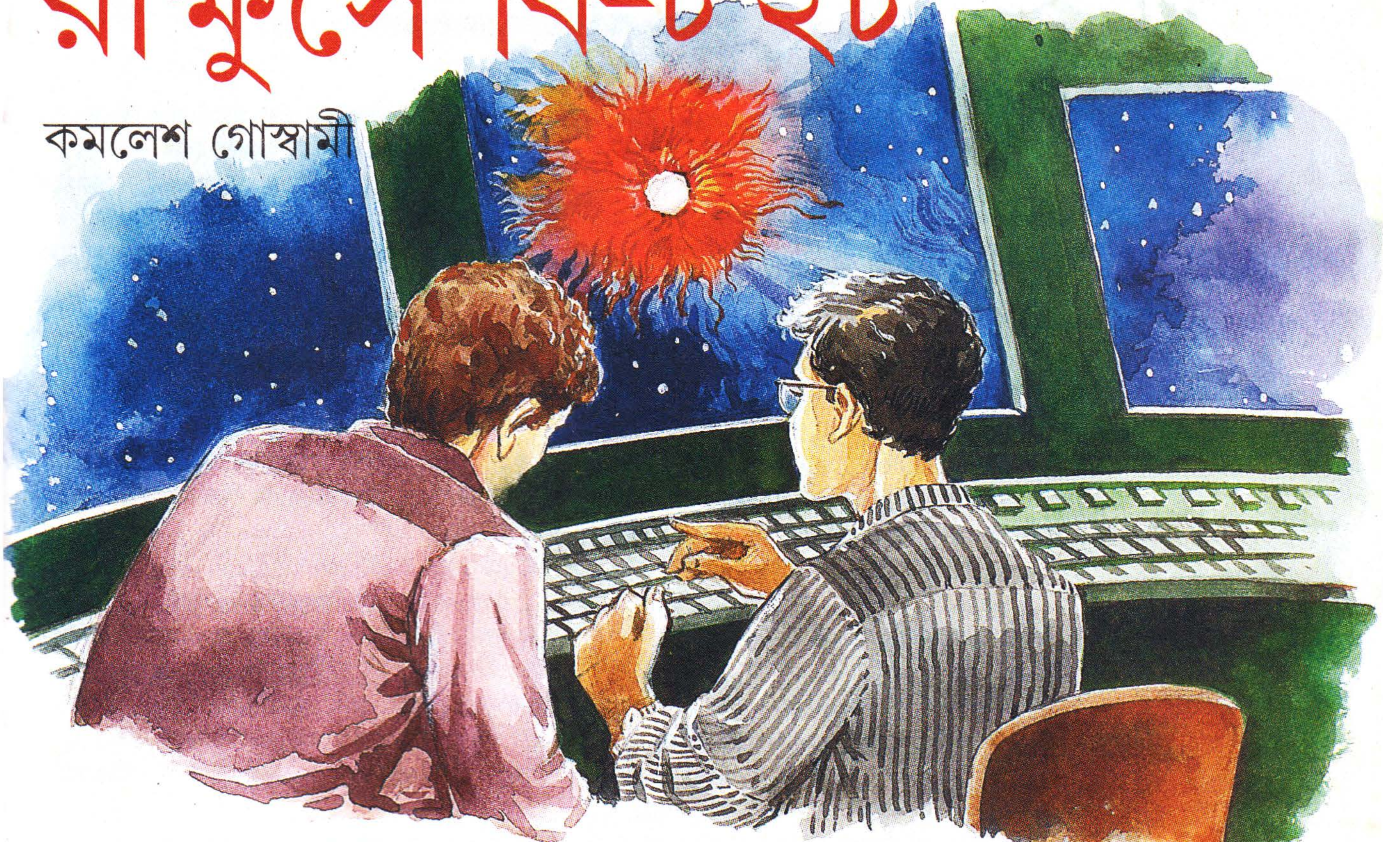
১৮৬৮ সালে চা-বাগানের মালিকদের উদ্যোগে দার্জিলিং প্ল্যান্টার্স ক্লাব গড়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়েই পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে প্রথম ঔপনিবেশিকদের ক্লাব কালচারের শুরু।

বাংলায় চা-চাষ ও শিল্প খুব তাড়াতাড়ি লাভজনক হয়ে উঠলেও এই ক্ষেত্রে বাঙালি উদ্যোগী আসেন অনেক দেরি করে। পরে এঁরা তরাই অঞ্চলেও বাগান তৈরি করেন। পাহাড়ে বাঙালি বা ভারতীয় মালিকানাধীন বাগিচা তেমন না থাকলেও বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে এঁরা অনেক বাগান গড়ে তোলেন এবং ব্যবসায়িকভাবে সফলও হন।

ফোটো: লেখক

রাক্ষুসে বি-৮২৮

কমলেশ গোস্বামী



ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসে প্রথম-প্রথম খুব খারাপ লাগত সৈকতের। সিডনি ইউনিভার্সিটিতে প্রোফেসর অ্যালান রক্সটার-এর অধীনে মহাকাশ গবেষণার সুযোগ পেয়ে এখন নিজেকে ধন্য মনে করে সৈকত। ওরা মাত্র পাঁচজন এই সুযোগ পেয়েছে। ভারত থেকে সৈকত, অস্ট্রেলিয়ার বথাম, ইংল্যান্ডের রাইট, কানাডার জন এবং ইউ এস এ-র হ্যারিস। তবে, হোম সিকনেস বেশিদিন কাবু করতে পারেনি ওদের। অধ্যাপক রক্সটারের অধীনে গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রথমেই হাব্‌ল টেলিস্কোপে কাজ করার সুযোগ পায় ওরা। অধ্যাপক রক্সটার এবং তাঁর সহকারী পেরিয়ার হাব্‌ল টেলিস্কোপ সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন ওদের। অধ্যাপক রক্সটার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর ভঙ্গিতে বলছিলেন, "আমার প্রিয় ছাত্রমণ্ডলী, তোমরা এবার পরিচিত হবে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের সঙ্গে। নাসা আর ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা 'এসা' ১৯৭০ সালের শেষদিকে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের কাজ শুরু করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাব্‌লের নাম অনুসারে এই মহাকাশ দূরবিনটির নামকরণ করা হয়। মাটি থেকে ৬০০ কিলোমিটার উপরে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ সবসময় পাক দিয়ে চলেছে পৃথিবীকে। হাব্‌ল টেলিস্কোপ আসলে অত্যন্ত উন্নত ধরনের প্রতিফলক দূরবিন। নিঃসীম মহাশূন্যে আয়না, ক্যামেরা আর স্পেকট্রোমিটারে চোখ দিয়ে মহাকাশের সমস্ত বস্তুকে খুঁজে বের করে তার যাবতীয় তথ্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই এই টেলিস্কোপের কাজ। তোমাদের কাজ হবে এই টেলিস্কোপের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং ডিজিটাল সংকেত থেকে ছবি সংগ্রহ করা। তা ছাড়া স্পেকট্রোমিটারের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গ্রহ-তারাদের রাসায়নিক গঠন, তাপমাত্রা, বয়স, গতিবেগ ইত্যাদি বের করতে হবে তোমাদের।"

প্রথম দিন থেকেই ওরা ভালবেসে ফেলেছিল হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপকে। মহাকাশের বিস্ময়কর জগৎ ক্রমেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল ওদের। কোথা দিয়ে যে কয়েকটা বছর কেটে গেল, ভাবতেও অবাক লাগে সৈকতদের। ২০০০ সালের জানুয়ারির একদিন অধ্যাপক রক্সটার ওদের বললেন, "পৃথিবী থেকে ২০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে বি-৮২৮ নামে একটি উজ্জ্বল লাল নক্ষত্র আছে। তোমাদের কাজ হবে প্রতি মুহূর্তে ওই নক্ষত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করা, হাব্‌ল টেলিস্কোপের ডিজিটাল সংকেত থেকে প্রতি মুহূর্তের ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা। আমার প্রিয় ছাত্রগণ, এই কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তোমাদের সব সময় এই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে থাকতে হবে। তোমরা পাঁচজন, আমি এবং পেরিয়ার সবাই মিলে যে যার দায়িত্ব ভাগ করে নেব। এই কঠিন দায়িত্বভার তোমরা পালন করতে পারবে তো?"

সবাই সমস্বরে জবাব দেয়, "পারব স্যার।"

অধ্যাপক রক্সটার আবার বলতে শুরু করেন, "এবার তোমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য দিচ্ছি। আমরা আশঙ্কা করছি, মহাকাশে এমন একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে, যা পৃথিবীর মানুষ এর আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। যদি আমাদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ ঠিক হয়, আমরা সবাই ইতিহাসের পাতায় প্রবেশ করব। তোমরা তোমাদের কাজ দায়িত্ব সহকারে নিখুঁতভাবে করে যাবে। অধ্যাপক পেরিয়ার তোমাদের পরবর্তী

নির্দেশ দেবেন। আজ থেকে তোমাদের গাডার্ড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে থাকতে হবে। তোমরা প্রস্তুত হয়ে এসো।"

পাঁচজন দ্রুত হোটেলে ফিরে গিয়ে নিজেদের টুকিটাকি জিনিস ব্যাগে ভরে ফিরে এল। অধ্যাপকের নির্দেশে খাবার খেয়ে তিনজনকে বাধ্যতামূলকভাবে রেস্টরুমে যেতে হল। ঘুম কি আর আসতে চায়? তবু অধ্যাপকদের নির্দেশ মেনে ঘুমের ক্যাপসুল খেয়ে তিনজন শুয়ে পড়ল। টানা ছ'ঘণ্টা ঘুমের পর ওরা উঠবে। সৈকত ও বথাম পর্যবেক্ষণকক্ষে আসে। অধ্যাপক রক্সটার ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সেই থেকে শুরু লাগাতার পর্যবেক্ষণ আর হাব্‌ল টেলিস্কোপের মাধ্যমে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ এবং পালা করে ওই বিশাল লাল রং-এর নক্ষত্রকে নজর রাখা। বি-৮২৮-এর রক্তিম উজ্জ্বলতা যেন দিন-দিন বাড়ছে। কয়েকদিন পর সৈকত ও বথামকে দেওয়া হল পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব। বথাম সৈকতকে বলল, "দ্যাখ সৈকত, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারাটার ঔজ্জ্বল্য যেন অনেক বেড়ে গেছে।"

সৈকত টেলিস্কোপের পাঠানো ছবিগুলোতে চোখ রাখে। সত্যিই তো, বি-৮২৮-এর রক্তিম ভাব যেন অনেক গাঢ় হয়েছে। অধ্যাপক দু'জন রাতে আবার এলেন। সৈকত, বথাম জানাল ওদের রিপোর্ট। গত দু'দিনে তারাটির ঔজ্জ্বল্য দ্বিগুণ হয়েছে। অধ্যাপক রক্সটার আনন্দে, উত্তেজনায় তাঁর সহকারী পেরিয়ারকে জড়িয়ে ধরেছেন। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন রক্সটার। পেরিয়ারকে বললেন, "নিশ্চয়ই কিছু ঘটতে চলেছে পেরিয়ার। আমার ২০ বছরের গবেষণা নির্ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে।"

ওদিকে টেলিস্কোপের পাঠানো ছবি ক্যামেরায় বন্দি হচ্ছে। সৈকত প্রশ্ন করে, "স্যার, আমরা কি কোনও কিছু দেখার আশা করছি?"

অধ্যাপকদের উত্তেজনা ওদেরও উত্তেজিত করেছে। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করে আছে অধ্যাপকের ব্যাখ্যার জন্য। অধ্যাপক রক্সটার ওদের বোঝান, "প্রিয় ছাত্রমণ্ডলী, আমার দীর্ঘ ২০ বছরের গবেষণার ফল তোমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছ। আমার নির্দেশমতো বি-৮২৮কে প্রতি মুহূর্তের জন্য নজরবন্দি করে রাখো, তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।"

প্রচণ্ড কৌতূহল চেপে রাখে পাঁচ বন্ধু। পালা করে তিনজন হাব্‌ল টেলিস্কোপের পাঠানো তথ্য এবং ফোটোগ্রাফি রেকর্ডিংয়ের উপর নজর রেখে চলেছে। দু'জন পালা করে বিশ্রামে। একজনের বদলি হয়ে আসেন কখনও অধ্যাপক রক্সটার বা সহকারী অধ্যাপক পেরিয়ার। রাত দুটো থেকে সৈকত ও বথামের পালা ফোটো রেকর্ডিংয়ের। হ্যারিসের দায়িত্ব স্পেকট্রোমিটারের তথ্য বিশ্লেষণ করা। টাইম ক্যাপসুল রাত দেড়টায় ওদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। খেতে-খেতে ওরা গত ছ'ঘণ্টার বি-৮২৮-এর ফোটোগ্রাফি রেকর্ডিং দেখছিল। গত ছ'ঘণ্টায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে বি-৮২৮। তারাটি যেন আমূল বদলে গেছে। মনে হচ্ছে বিশাল নক্ষত্রটির সমস্ত শরীর যেন রক্তাক্ত। নক্ষত্রটি যেন এক রক্তলোলুপ বিভীষিকা।

অধ্যাপক দু'জন বিশ্রাম করতে গেছেন। রাত তিনটের পর সৈকত দেখতে পেল, নক্ষত্রটির চারপাশ থেকে আবছা একটা রক্তবর্ণের ছটা। ডিজিটাল সংকেত থেকে পাওয়া ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করে অবাক হয় সৈকত। মনে হচ্ছে কতগুলো রক্তবর্ণের জিভ বি-৮২৮-এর চারপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, নক্ষত্রটি তার লেলিহান জিভ বের করে মহাকাশে গ্রাস করার সামগ্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে। দৃশ্যটি খুব অস্পষ্ট। সৈকত ভাবে ও খুব বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে না তো! এতক্ষণ একনাগাড়ে বি-৮২৮-এর দিকে নজর ছিল। তাই আশপাশে সেভাবে নজর দেওয়া হয়নি। সৈকত বথামকে বলে বি-৮২৮-এর চারপাশের জিভগুলোর ছবি স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে। সৈকত চারপাশের গ্রহগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। হঠাৎ সৈকতের চিৎকারে চমকে ওঠে বথাম। সৈকত উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, "ওটা কী হচ্ছে?"

সৈকতের দিকে ঝুঁকে পড়ে বথাম। সৈকত ওকে বি-৮২৮-এর নিকটবর্তী গ্রহটির দিকে তাকাতে বলে। হ্যারিসকে বলে, বি-৮২৮-এর সঙ্গে ওই গ্রহটির ছবিও রেকর্ড করে রাখতে। অবাক বথাম দ্যাখে, গ্রহটি যেন তীব্রবেগে বি-৮২৮-এর দিকে ছুটে আসছে। যেন এক অমোঘ আকর্ষণে, দুর্বার গতিতে ছুটে আসছে গ্রহটি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওরা দেখতে থাকে গ্রহটির ছুটে আসা।

বি-৮২৮-এর দিকে নজর দেয় সৈকত। নক্ষত্রটির জিভগুলো যেন আরও রক্তাক্ত, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। নক্ষত্রটির ভয়ংকর আকর্ষণে তীব্রবেগে ছুটে আসছে গ্রহটি। ক্রমাগত গতিবেগ বেড়েই চলেছে। গ্রহটি নক্ষত্রটির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। উত্তেজনায় তিন বন্ধুর নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। হঠাৎ বি-৮২৮-এর রক্তিম উজ্জ্বল বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই গ্রহ। কিছুক্ষণের জন্য একটি বাষ্পীয় বলয় আঁধার করে রাখল বি-৮২৮কে। ঘটনার আকস্মিকতার রেশ কাটতেই সৈকত জরুরি সিগন্যাল পাঠাল অধ্যাপক দু'জনের কাছে। ওঁদের আসতে কিছুটা সময় লাগবে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে টেলিস্কোপের পাঠানো ছবিগুলো দেখতে থাকে সৈকত ও বথাম। বাষ্পবলয়ের ভিতরে নক্ষত্রটিকে দেখা যাচ্ছে। গাঢ় রক্তবর্ণ নক্ষত্রটির বুকে একটি হিরের থালার মতো গ্রহটি বসে গেছে। ক্রমাগত বাষ্প বের হচ্ছে। ক্রমে-ক্রমে গ্রহটি যেন বিশাল নক্ষত্রটির বুকে মিশে যাচ্ছে। তারাটি ক্রমেই গ্রাস করছে গ্রহটিকে। ছুটতে-ছুটতে এলেন অধ্যাপক দু'জন। সৈকত আর বথামকে সরিয়ে দিয়ে রক্সটার টেলিস্কোপের পাঠানো ছবিগুলো দেখতে থাকেন। একটু পরেই ইউরেকা বলে চিৎকার করে ওঠেন রক্সটার। পাগলের মতো নাচতে থাকেন তিনি। তারপর জড়িয়ে ধরেন পেরিয়ারকে। সৈকত, বথাম ও হ্যারিসের হাত ধরে ঝাঁকাতে থাকেন। পাগলের মতো বলতে থাকেন রক্সটার, "আমাদের ২০ বছরের সাধনা সার্থক। পৃথিবীতে আমরাই প্রথম, যারা তারার গ্রহ গ্রাস করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। ধন্যবাদ সৈকত, ধন্যবাদ বথাম, হ্যারিস। পৃথিবীতে তোমরাই প্রথম এই অদ্ভুত দৃশ্য



রাক্ষুসে বি-৮২৮

দেখতে পেলে।”

রেকর্ড করা ছবিগুলো বারবার রিভিউ করে দেখতে থাকেন ওঁরা। রক্সটার বললেন, “বলো সৈকত, এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলো।”

সৈকত বিস্তারিতভাবে ওর অভিজ্ঞতার কথা শোনায় অধ্যাপকদের। শুনতে-শুনতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন অধ্যাপক দু’জন। অধ্যাপক রক্সটার পেরিয়ারকে বলেন, “পেরিয়ার, আমাদের গবেষণা সফল। আমরাই প্রথম বিশ্ববাসীকে দেখাব ‘তারকাসুর’-এর গ্রহ-গ্রাসের ছবি।”

হাব্‌লের পাঠানো ছবি দেখছিল সৈকত। অধ্যাপক রক্সটারের মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করে ও বলল, “স্যার, বি-৮২৮ ক্রমেই যেন উজ্জ্বলতর হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে সূর্যের চেয়ে এই তারাটির ঔজ্জ্বল্য কয়েক হাজার গুণ বেশি।”

রক্সটার ছবিগুলো দেখতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর সৈকতকে বলেন, “তোমার পর্যবেক্ষণ সঠিক। এখন থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ করো। ছবি তোলো। রেকর্ড রাখো। আমাদের গবেষণার জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের রেকর্ড রাখা অত্যন্ত জরুরি।”

গত দু’মাসে ওরা গবেষণাগারের বাইরে যায়নি। এই দু’মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বি-৮২৮ আরও দুটি নক্ষত্রকে গ্রাস করেছে। এখন তারাটির ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে প্রায় ছ’লক্ষ গুণ বেশি। প্রোফেসর রক্সটার ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফেলেছেন। সৈকতদের তোলা ছবি পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন তুলেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে আমন্ত্রিত হয়েছেন অধ্যাপক রক্সটার ও তাঁর সহকর্মীরা। ওঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বের প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমগুলোর উপস্থিতিতে অধ্যাপক রক্সটার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন রক্সটার—

সাংবাদিক: আপনি কী করে নিশ্চিন্ত হলেন দু’হাজার সালেই এমন একটা ঘটনা ঘটবে?

রক্সটার: আমার ২০ বছরের গবেষণা তারার গ্রহ-গ্রাস সম্বন্ধে নানা তথ্য পেতে সাহায্য করেছিল। তারার ভিতরে আকর্ষণশক্তি বাড়লে তারাটি ক্রমশ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। লোহিতবর্ণ ক্রমেই গাঢ় হয়। এর পর যে-কোনও সময় নিকটবর্তী গ্রহটিকে গ্রাস করার ক্ষমতা অর্জন করে ওই তারাটি।

সাংবাদিক: বি-৮২৮-এর ঔজ্জ্বল্য এই মুহূর্তে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে ছ’লক্ষ গুণ বেশি। এ-সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কী?

রক্সটার: যখন কোনও নক্ষত্র কোনও গ্রহকে গ্রাস করে তখন সেই নক্ষত্রের মধ্যে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। সেই কারণে তাপমাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়, ফলে ঔজ্জ্বল্যও বাড়ে।

সাংবাদিক: নক্ষত্রের এই তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি কি মহাকাশের অন্যান্য গ্রহের পক্ষে হানিকর নয়?

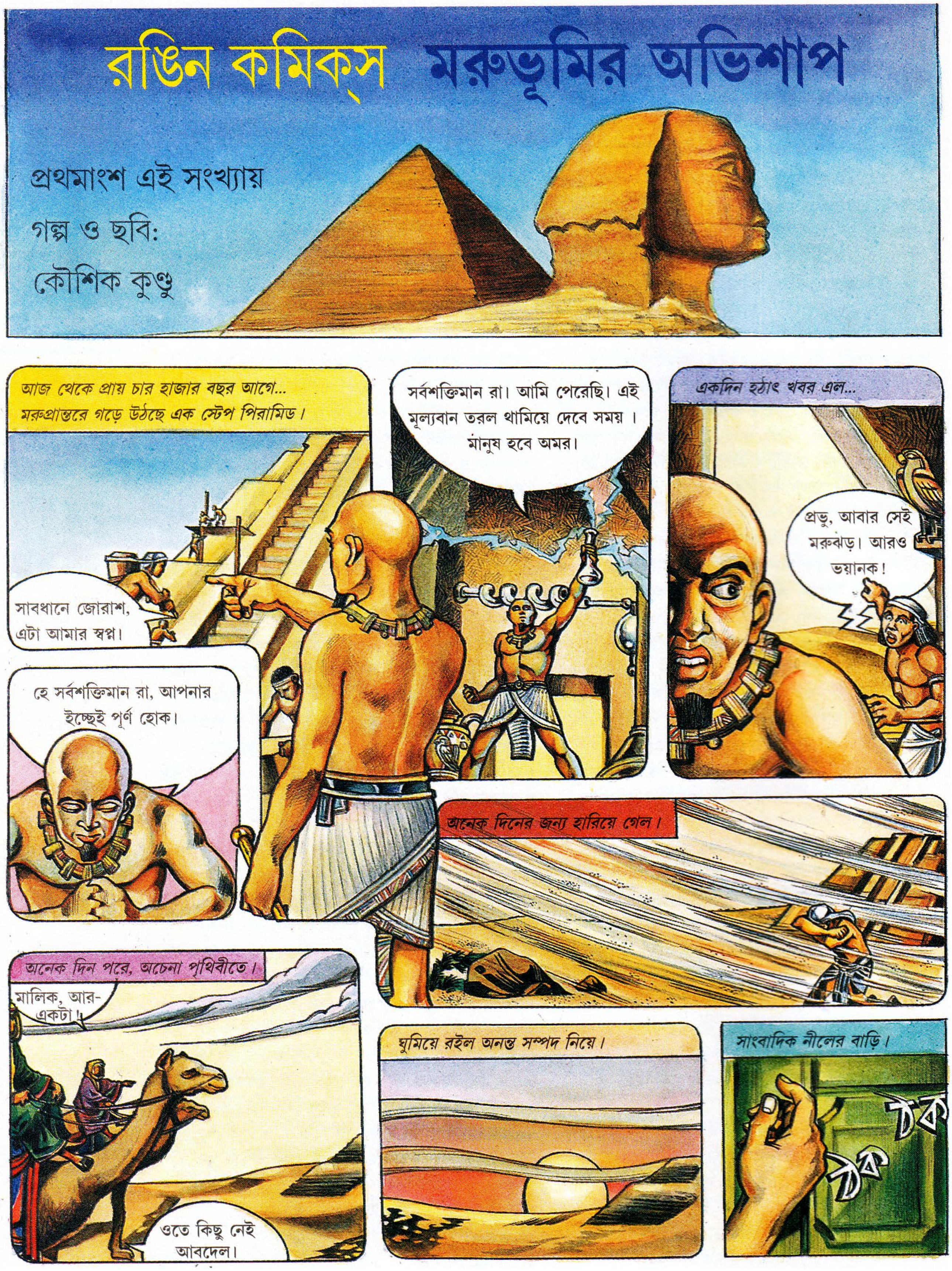
রক্সটার: মহাজাগতিক নিয়মে যা ঘটবার তাই ঘটে চলেছে। তবে বি-৮২৮-এর এই ঔজ্জ্বল্য এবং তাপমাত্রা স্থায়ী নয়। তিনটি গ্রহকে বি-৮২৮ গ্রাস করেছে। এই আত্তিকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হলে বি-৮২৮ ধীরে-ধীরে আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরে আসবে। তাপমাত্রা কমার সঙ্গে-সঙ্গে ঔজ্জ্বল্যও কমবে।

সাংবাদিক: আপনার কি মনে হয় না, সূর্য একদিন পৃথিবীকে এভাবে গ্রাস করে নেবে?

রক্সটার: এরকম আশঙ্কা যে একদম নেই, তা বলা যায় না। এখন থেকে এক কোটি বছর পরে সূর্য এক বিশালকায় লাল নক্ষত্র হয়ে উঠবে। তখন কী হবে বলা শক্ত। আমরা অনুমান করছি, গাঢ় রক্তবর্ণের সূর্য প্রথমে বুধ তারপর শুক্র গ্রহকে নিজের শিকারে পরিণত করবে। আমি আগেই বলেছি, যখন একটা তারা একটা গ্রহকে গ্রাস করে, তখন তার ভিতরে নিরন্তর বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। সুতরাং তখন সূর্যের তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্য যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সেক্ষেত্রে সূর্যের তিন নম্বর শিকার পৃথিবীও হতে পারে! তবে এ-বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আরও গবেষণা ও অনুসন্ধান দরকার।

এর পর সৈকতের তোলা মহাকাশচিত্র ‘তারকাসুরের গ্রহ-গ্রাস’ দেখানো হল। বিপুল সংবর্ধনা পেলেন অধ্যাপক ও তাঁর সহযোগীরা। সারা বিশ্বের প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ছবিসহ অধ্যাপকের বক্তৃতা প্রকাশিত হল। ভোজসভায় দারুণ খাওয়াদাওয়া হল। বিপুল অভিনন্দন নিয়ে হোটেলে ফিরলেন সবাই। গত কয়েক মাস অমানুষিক পরিশ্রম ও উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। হোটেলে এসে টিভি চ্যানেল খুলে আজকের প্রোগ্রামের টেলিকাস্ট দেখতে থাকে সৈকত। ক্লান্তিতে দু’চোখের পাতা বুজে আসছে। ধীরে-ধীরে ঘুম এসে সৈকতের দু’চোখের পাতা এক করে দিল। ঘুম গাঢ় হতে চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বি-৮২৮-এর রক্তলোলুপ জিভ আকর্ষণ করছে গ্রহটিকে। রক্তাক্ত বুকে হিরের থালার মতো ডুবে যাচ্ছে গ্রহটি। হঠাৎ ঘুমের মধ্যেই বদলে যায় ছবিটা। সূর্য এক রক্তদানব হয়ে একে-একে গ্রাস করছে বুধ আর শুক্রকে। তারপর তার রক্তলোলুপ জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দিকে। সূর্যের অমোঘ আকর্ষণে পৃথিবী ছুটছে সূর্যের দিকে। চিৎকার করে ওঠে সৈকত, “না।” ঘুম ভেঙে যায়। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। একটু ধাতস্থ হয়ে হেসে ফেলে সৈকত। ভাবে, ওকে ঘুমের মধ্যেও তাড়া করে ফিরছে তারকাসুর! এক কোটি বছর পরে কী হবে, তা কি এখনই অনুমান করা সম্ভব? বিজ্ঞান তখন অনেক উন্নত হবে। যদি অবধারিতভাবে পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চিত হয়, তবে হয়তো মানুষ অন্য গ্রহে চলে যাবে। না, কাল থেকে আবার ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে। গবেষণার নতুন অধ্যায়ের কাজ শুরু হবে। এখন একটু নিটোল ঘুম দরকার। চার ঘণ্টার ঘুমের একটা ক্যাপসুল খেয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমের দেশে এগিয়ে যায় সৈকত।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল



রঙিন কমিক্স
মরুভূমির অভিশাপ
প্রথমাংশ এই সংখ্যায়
গল্প ও ছবি:
কৌশিক কুণ্ডু
আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে... মরুপ্রান্তরে গড়ে উঠছে এক স্টেপ পিরামিড।
সাবধানে জোরাশ, এটা আমার স্বপ্ন।
হে সর্বশক্তিমান রা, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।
সর্বশক্তিমান রা। আমি পেরেছি। এই মূল্যবান তরল থামিয়ে দেবে সময়। মানুষ হবে অমর।
একদিন হঠাৎ খবর এল...
প্রভু, আবার সেই মরুঝড়। আরও ভয়ানক!
অনেক দিনের জন্য হারিয়ে গেল।
অনেক দিন পরে, অচেনা পৃথিবীতে।
মালিক, আর-একটা!
ওতে কিছু নেই আবদেল।
ঘুমিয়ে রইল অনন্ত সম্পদ নিয়ে।
সাংবাদিক নীলের বাড়ি।
টক
টক



আরে, যাচ্ছি রে বাপু।
দরজাটা বন্ধ করো। জলদি!
উঃ!
আরে প্রোফেসর গোমেজ, হঠাৎ! আপনার গবেষণা কদ্দুর?
আপনাকে উদ্বিগ্ন লাগছে প্রোফেসর! ব্যাপার কী?
বিপদ, ভীষণ বিপদ! যে-কোনও সময় খুন হয়ে যেতে পারি!
সে কী!
ভাই জগবন্ধু, তুমি কি জানলার পরদাগুলো একটু টেনে দেবে?
ব্যাপারটা গোলমেলে। বলো তো, মানুষ আবহমানকাল কিসের আকাঙ্ক্ষা করে এসেছে? অমরত্ব, তাই না? নিজেকে আর তার প্রিয় জিনিসগুলোকে মানুষ ফুরিয়ে যেতে দিতে চায় না।
লাট্টু, প্রোফেসরের প্রিয় পোষ্য
দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খান
কিংবা তরুণ গ্রিক বিশ্বজয়ী, সবাই কিন্তু সময়ের কাছে পরাজিত।
কো-ইনসিডেন্ট বলতে পারো। আমার গবেষণার বিষয়টাও একই।
বলেন কী প্রোফেসর, আজকের দিনে অমরত্বের কি কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে?
আছে।



আদিম মানুষ মৃত্যুর কাছে যেমন অসহায় ছিল, আধুনিক মানুষও তাই।
কিন্তু প্রোফেসর, জগৎ স্থায়ী আর মানুষ নশ্বর, তাই না!
ভুল বললে, ব্রহ্মাণ্ডেরও মৃত্যু আছে।
আমার প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু কার্ল তখন মিশরে। হঠাৎ...
পাবলো, তাড়াতাড়ি এসো। একটা পুরনো প্যাপিরাস লিপি পেয়েছি। এটা অবিশ্বাস্য!
তুমি ঠিক হয়ে যাবে কার্ল!
জানি, হব না। ওটা অভিশপ্ত। কেন যে তোমাকে দিলাম!
ওটাকে নিয়ে গেলাম প্রখ্যাত হিয়েরোগ্লিফিক ভাষাবিদ হিগিন্সের কাছে, পাঠোদ্ধারের জন্য।
কবে আসব?
নেক্সট উইকে আসুন।
?!
প্রোফেসরকে দেখে অভুক্ত মনে হচ্ছে!
মাফ চাইছি প্রোফেসর! এখনই আসছি।
রঘুদা, প্রোফেসরের জন্য কিছু খাবার আনো।
এখনই আনছি।


ওটা কী প্রোফেসর?
সোনার চাবিকাঠি হে! বড় ঝামেলার জিনিস!
প্রোফেসর কি একটানা কোনও গরমের দেশে ছিলেন? অনেকটা তামাটে হয়ে গেছেন!
ঠিক।
অনুবাদটা দেখে আমার চক্ষুস্থির! এটা চার হাজার বছর আগের এক মিশরের পণ্ডিতের লেখা, যিনি ছিলেন ফারাওয়ের নিজের ভাই, আম-এন-আটন।
??
কার্ল এটা পেয়েছে একটা স্টেপ পিরামিডের ভগ্নস্তূপ থেকে। ভাবছি, এঁর লেখাটা যদি সত্যি হয়!
আর দেরি করা যাবে না। নেক্সট ফ্লাইটটা পেয়ে যাব।
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো যেতে হবে। তারপর...
Check in information
মরুশহরে পৌঁছে তার করে দিলাম আমার ল্যাবরেটরির সরঞ্জামের এজেন্ট পিয়ের্দাকে। আর আমি ভাবছিলাম...
এখানেই কোথাও আছে সেই অমূল্য ভাণ্ডার!
হোটেলের লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছি। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিলনদ। হঠাৎ...
আরে বুড়ো ওস্তাদ!
তোমার তার পেয়েছি। লিস্টিও সব হয়ে যাবে। মরুভূমিতে ল্যাবরেটরি বানাবে নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ!
জিনিস তো রেডি! কিন্তু যাবে কোথায়?
আমার ম্যাপ আছে। কিন্তু তোমাকেই পৌঁছে দিতে হবে।
ম্যাপ অনুযায়ী কাছাকাছিই। আরে ওই তো!


ক্কে? কে ওখানে? পরদার আড়ালে?
চিন্তা নেই প্রোফেসর! ও রঘুদা। আপনার প্রাতরাশ এনেছে।
ধন্যবাদ। খাওয়াটাওয়াও তেমন...সব সময় আতঙ্ক! এর মধ্যে স্ত্রী মারা গেলেন।
সেই প্রাচীন কক্ষের ভিতরেই আবার এক্সপেরিমেন্ট করব। আশ্চর্য! সরঞ্জামগুলো ঠিকই আছে!
ওহ্ ঈশ্বর! এ কী, ভুল করলাম আমি!
এর পর থেকেই এক রহস্যময় আতঙ্ক আমার পিছনে তাড়া করে ফিরছে...
আসলে এসব বলতে আমি আসিনি। তুমি তো জানো...
আমার মেয়ে পিটি। আমার এই দুর্ভাগ্যের ভাগীদার করে তাকে আর রাখতে চাই না। তাই...
তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি এক নির্জন শৈলশহরের হস্টেলে।


আমি দুঃখিত। কিন্তু কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?
সেরেছে!
মৃত্যুর এক করাল ছায়া সারাক্ষণ আমার পাশে-পাশে। যে-কোনও সময় সে গ্রাস করবে আমাকে!
তোমাকে আমাদের ফ্যামিলি-ফ্রেন্ড বলেই মনে করি। তাই আমার কিছু হলে ওকে কোনও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে। দরকার হলে ওর মায়ের দেশ কানাডায়ও! আর সেইসঙ্গে...
চেষ্টা করে দেখতে পার, রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় কি না! প্যাপিরাস নথি, ম্যাপ আর ওই সোনার চাকতিটা রেখে গেলাম। এবার আমি যাব।
আমি আপনাকে বের করে দিচ্ছি প্রোফেসর।
পিছনের দরজাটা কিছুটা নিরাপদ।
কিন্তু প্রোফেসর, আপনি বলেননি আপনার শত্রু কে?
শুনলেও কি বুঝবে?
তবে শোনো। আমাকে যে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়, তার নাম প্রোফেসর পা-ব-লো গো-মে-জ।
বিদায় বন্ধুরা!
?!


প্রোফেসরের কথাবার্তা কেমন যেন লাগছে, না?
তবে উনি যে খুব বিচলিত সেটা বোঝা যাচ্ছে। উনি আমাদের উপর নির্ভর করছেন।
প্রোফেসরকে আপনার কী দরকার?
ওঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের গাড়িতেই ফিরবেন।
আবার কে এল?
কে ভাই? প্রোফেসরকে চাই?
আপনার ভুল হচ্ছে ভাই। উনি তো আজ আসেননি!
সে কী! ওঁকে এখানেই আসতে দেখলাম যেন! মাফ করবেন।
এটা কী করলি নীল! বেচারা ড্রাইভার ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিল!
ব্যাপারটা অত সরল নয় জগাদা। ওর পোশাকটা দেখেছ? আর জুতোটা? লোকটা এখানকারই নয়। আর এটাও ভেবে দ্যাখো, একজন ড্রাইভারের পক্ষে যাত্রীর পরিচয় জানাটা কতটা স্বাভাবিক। দাঁড়াও, জানলায় দেখছি।
যা ভেবেছি। লোকগুলোর কাছে আর্মস আছে! আর ওরা প্রোফেসরকে খুঁজছে, ভাল উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। প্রোফেসরের বেশ বিপদ দেখছি। এখন বুঝেছ জগাদা, কেন ওদের প্রোফেসরের হদিশ দিইনি?



ক'দিন পরে
আরে নীল, একটা টেলিগ্রাম! প্যাট্রিসিয়ার!
আমাদের এখনই যেতে বলেছে। লিখেছে, ও দিশেহারা!
?!
ওর লেখা দেখে মনে হচ্ছে খুব আতঙ্কে আছে!
চটপট জগাদা! সকালেই ট্রেন আছে।
নাও, হয়ে গেল!
কিছুই তো বুঝছি না হে!
আমাদেরটা সাত-এ জগাদা!
নেমেই ব্যাগটা খুলে লাট্টুকে বের করে নিতে হবে।
হস্টেলটা শহরের বাইরে।

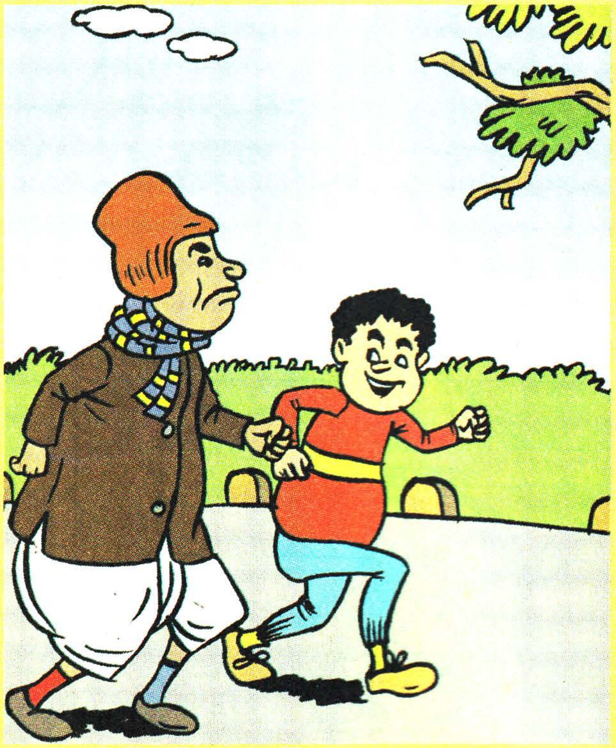

এই তো হস্টেলটা পেয়েছি।
HOST
ফ-র-র
আরে দরোয়ানজি! উঠিয়ে।
দাঁড়াও, তোমার পাহারার নমুনাটা একবার সুপারিন্টেনডেন্টকে জানিয়ে আসি!
ঘ-র-র-র
কৌন হ্যায়? তোর দেঙ্গে।
আরে ভাই, শোনোই না।
ইয়ে বাত হ্যায়। পহলে বাতানা চাহিয়ে যানা! পিটি মেমসাব? থার্ড ফ্লোর চলা যাইয়ে। চৌথা কামরা।
এদিকে জগবন্ধু...
এই তো পেয়েছি!
ব্যাপারটা ঠিক কী বলো তো? এদিকে প্রোফেসর...
হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো! হতভম্ব হয়ে গেছি!
এই যে প্যাট্রিসিয়া।
ওহ্ নীল! জানতাম, আসবে।
যাই, ঘুরে আসি।
কিন্তু জগাদা কোথায় গেল?
বাইরে গোলমাল হচ্ছে না?
জগাদা এল ঠিকই, তবে...
একে আমার অফিসের সামনে ধরেছি। ওর মুখে তোমার নামটা শুনে...
ভুল হচ্ছে ম্যাডাম। উনি আসলে আমার গেস্ট। আমার কাছেই আসছিলেন।



(এর পর আগামী সংখ্যায়)

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো

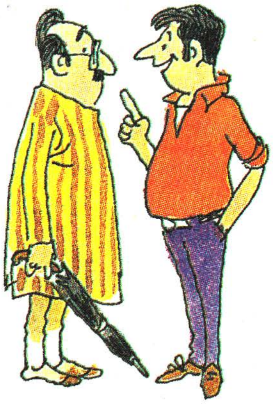




উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

হা স ছি দ্যা খো

ভবরঞ্জনবাবু কোটিপতি। প্রাসাদোপম বাড়ি তাঁর। ভবরঞ্জনবাবুর একটাই শখ, জ্যান্ত কুমির সংগ্রহ করা। বাড়ির সামনে পুকুর, আর সেই পুকুরে ধরে আনা সব কুমিরদের রেখে দিয়েছেন তিনি। একদিন বিশাল এক ভোজসভার আয়োজন করলেন ভবরঞ্জনবাবু। আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা প্রচুর। ওই ভোজসভায় তিনি ঘোষণা করলেন, যে তাঁর ওই ভয়ংকর কুমিরভর্তি পুকুর সাঁতরে এপার-ওপার করতে পারবে, তাকে তিনি এক কোটি টাকা অথবা তাঁর ওই বিশাল বাড়ি পুরস্কার হিসেবে দেবেন। তাঁর কথা শেষ-হতে-না-হতেই শোনা গেল জলের ঝপাং-ঝপাং আওয়াজ। উপস্থিত সবাই দেখলেন, পুকুর সাঁতরে পাড়ে উঠে আসছে এক যুবক। ঝপাঝপ হাততালি পড়তে লাগল।



ভবরঞ্জনবাবু যুবকটিকে বললেন, "অবিশ্বাস্য কাণ্ড করেছ তুমি! এখন কী চাই তোমার বলো, এক কোটি টাকা না আমার বাড়ি?"

যুবকটি হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "আপনার টাকাও আমার চাই না, বাড়িও না।"

"তবে কী চাই তোমার?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ভবরঞ্জনবাবু।

"আমার চাই সেই লোকটিকে, যে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল," চারদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল ওই যুবক।

তপনবাবু রোজই দেরি করে অফিসে আসেন। এজন্য তাঁর বস প্রতিদিন তিরস্কার করেন তাঁকে। দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তপনবাবু বলেন, বিছানায় শোওয়ার পর তাঁর ঘুম আসতে চায় না। বলতে গেলে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। আর তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায় তাঁর। বস তাঁকে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিলেন। পরদিনই নামী এক ডাক্তারের কাছে গেলেন তপনবাবু। খুব ভাল করে চেক করার পর ডাক্তারবাবু ঘুমের ওষুধ দিলেন তাঁকে। বললেন যে, এটা খেয়ে শুলে ভাল ঘুম হবে সারারাত। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে আর কোনও অসুবিধে হবে না। তপনবাবু যথারীতি ডাক্তারের পরামর্শমতো কাজ করলেন। ঘুমও ভাঙল বেশ সকালে। বহুদিন পর ঠিক সময়মতো অফিসে গিয়ে হাসিমুখে বসের সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা বললেন। "আজ আর লেট হয়নি স্যার," বসকে বললেন তিনি।

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু গতকাল আপনি এলেন না কেন?" প্রশ্ন করলেন বস।

ওলট পালট



কেমিস্ট্রি গবেষক যেভাবে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেন

পাশে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি। এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভিতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে উপরের কার্টুন ছবির সংকেতের সমাধান।

অবিরস্তল্প

দেহগ্রবিব

আশকুকাসুম

রতজয়জন্তী

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কৃত্রিমভাবে চুলের রং পালটানোকে যা বলা যায়

'কে শ ক লো প'

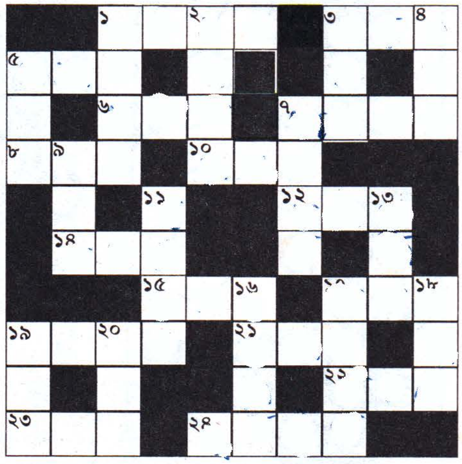
গত সংখ্যার সঠিক শব্দ:
পল্লিমঙ্গল, লোকসঙ্গীত, শমনসদন, হিসেবনিকেশ

ঘোষক

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো-র উত্তর

(১) আকাশে পাখি নেই। (২) লোকটির গোঁফ নেই। (৩) ছেলেটির চুলের রং কালো। (৪) লোকটির বগলে লাঠি নেই। (৫) ছেলেটির জামার ডিজ়াইন অন্যরকম। (৬) লোকটির মোজার রং পালটে গেছে। (৭) রাস্তার ধারে পাথরের সংখ্যা বেশি। (৮) লোকটির কোটের বোতামের সংখ্যা কম।

শব্দসন্ধান



সংকেত: পাশাপাশি

(১) অন্যমনস্ক, উদাসীন। (৩) পথ, বড় রাস্তা। (৫) জেগে আছে এমন, সতর্ক। (৬) এদের কামড়েই ম্যালেরিয়ার ভয়। (৭) দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত নদী। (৮) 'যতন করহ, লাভ হইবে—'। (১০) যে মাঠে গোরু চরায়। (১২) সাঁওতালি নাচের সঙ্গে এই বাদ্য বাজে। (১৪) বড় শহর। (১৫) ছেলেমানুষ। (১৭) অথই, অগাধ। (১৯) সারাদিন। (২১) শোকপ্রকাশ, আক্ষেপ, খেদ। (২২) পা, পদ। (২৩) শোওয়া, নিদ্রা। (২৪) পূজার যোগ্য, শ্রদ্ধেয়।

উপর-নীচ

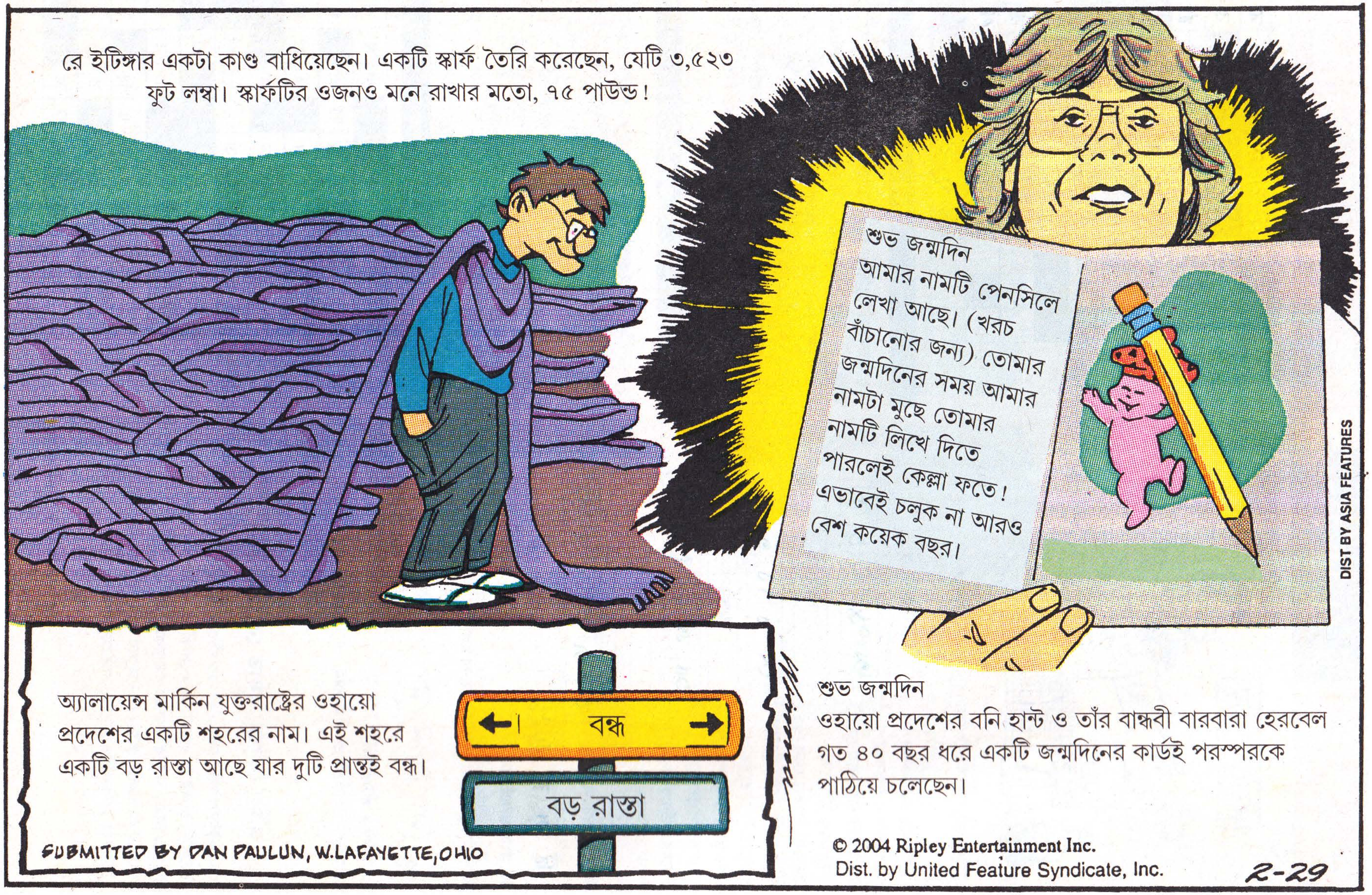
(১) এসে উপস্থিত হওয়া। (২) পরিহাস, ঠাট্টা, তামাশা। (৩) খরিদ, কেনাকাটা। (৪) খোঁপা। (৫) ধৈর্যধারণ, অপেক্ষা, দেরি। (৭) বহু লোকের মিলিত চিৎকার, হট্টগোল। (৯) সূর্য, দিবাকর। (১১) রাজসভা। (১৩) লজ্জা পেয়েছে এমন। (১৬) আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করেন যিনি। (১৭) অপব্যয়, ক্ষতি। (১৮) রামায়ণে দেখা যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরতেন তাঁর এই অনুজ। (১৯) সূর্য। (২০) গৃহ, আলয়, বাসস্থান।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

		অ	বা	ক			বে	হু	লা
গ	র	ব		রা	জ	টি	কা		জু
গে		স	না	ত	ন		র	জ	ক
শ	হ	র			ম		ভা		
	জ				ত	র	তা	জা	
	ম	হা	জ	ন				গ্র	
		ত		গ			অ	ত	ল
প	র	খ		রা	জ	ক	বি		হ
শি		র	ক্ত	জ	বা		চা	ক	র
ম	রি	চ			ব	ন্দ	র		

রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি




গাবলু
শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়
ভৌ-ভৌ
ভৌ-উ-ফ
©2003 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved.
DON TRACHTE
10-12

নানা রঙের বাসর



বানান ভুলতে মানা

কুইজ্ কন্টেস্টের পর এবার স্পেলিং কনটেস্ট। ২০ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে 'লিঙ্ক পেন অ্যান্ড পেনসিল লিমিটেড'-এর উদ্যোগে 'স্পেলিং ওয়ার্ড ক্র্যাকার'-এর ফাইনাল রাউন্ডের আয়োজন করা হয়েছিল। লিঙ্ক পেনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপক জালান জানান, এস এম এস-এর হুজুগে ছাত্রছাত্রীদের বানান এবং অভিধানের দক্ষতা ক্রমশ কমছে। তাই 'এনকারেজিং লিটেরেসি ' থিমের মাধ্যমে ১৯৯৯ থেকে লিঙ্ক শুরু করেছে বানানের প্রতিযোগিতা। এ-বছর অংশগ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলার ৬০০টি স্কুলের ৬৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে থেকে সেরা আটটি স্কুল ফাইনাল রাউন্ডে অংশগ্রহণ করে। প্রথম পুরস্কারটি জিতে নিল অশোক হল স্কুল। দ্বিতীয় পুরস্কার পেল ক্যালক্যাটা বয়েজ স্কুল এবং মর্ডান হাই স্কুলের সঙ্গে তিনবার টাই হওয়ার পর তৃতীয় স্থানে জুয়িশ গার্লস স্কুল। বিজয়ীরা প্রত্যেকেই পেল লিঙ্কের তরফ থেকে গিফ্‌ট চেক, সার্টিফিকেট, বিশেষ উপহার এবং ট্রফি। বাকি পাঁচটি স্কুলের জন্য ছিল উপহার এবং সার্টিফিকেট।

অভিযান সন্ত্রাস

রনি, পিকলু, কেকা, বিট্টু এবং অপরিহার্য 'অদ্ভুত' এবার 'স্করপিয়ান কিং'-এর মুখোমুখি। তাও আবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন খোদ কলকাতার বুকে রেড রোডে! তার জন্য ২৬-এ জানুয়ারি সকাল থেকে রেড রোডে লাইন দিতে হবে না! শুধু টিভির সামনে বসে পড়লেই হবে। দেখবে সন্ত্রাস চালিয়ে দেশ বিদেশের রাজা হওয়ার বাসনা স্করপিয়ান কিং-কে কীভাবে কলকাতায় টেনে আনে। শুধু গ্রাফিক্স, ডবল ক্যামেরা এবং দুর্ধর্ষ টেকনোলজির সাহায্যে পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল। কিন্তু আর বলব না। বাকিটা তোমরা নিজেরাই দেখে নিও আকাশ বাংলায় ২৪ জানুয়ারি থেকে।

মোহনা চৌধুরী

ছোটদের কাছে আক্রমের মেসেজ

"নিয়মিত ব্যায়াম করো, স্বাস্থ্যকর খাবার খাও, ব্লাড শুগার নিয়মিত মেপে নাও, এবং সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করো" — 'আক্কু-চেক ইনসপিরেশন সিরিজ, ২০০৪'-এ এটাই ছিল ছোটদের কাছে ওয়াসিম আক্রমের মেসেজ। দিল্লির ১০টি স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওয়াসিম আক্রমের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাল। আক্রম জানালেন, ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ নিতে তাঁর কোনও অসুবিধে হয়নি। শুধু দরকার ঠিকঠাক চিকিৎসা করানো এবং ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা। ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশনের মতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাওয়াদাওয়ার অভ্যেস, জীবনযাত্রার ধরন, শারীরিক সক্রিয়তা ইত্যাদি অনেক বদলে গেছে বলে খুব অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।



বি ডি মেমোরিয়ালের নতুন কোর্স

বি ডি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট চালু করছে কয়েকটি নতুন কোর্স। নবম শ্রেণি থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকলের কথা ভেবেই বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে। এই উপলক্ষে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর। উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল উষা মেহেতা। কেজোকথার পাশাপাশি সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের মনমাতানো অনুষ্ঠান সকলকে আনন্দ দিয়েছে।

পায়েল সেনগুপ্ত

ছবি আঁকার বই

ছোটদের ছবি আঁকতেই হয় স্কুলের আঁকার ক্লাসে। এ ছাড়া অনেক রকমের 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' তো হয়ই। তাই ছোটদের ছবি আঁকতে সাহায্য করবে এমন বই অভিভাবকরা খোঁজেন। বাজারে ছবি আঁকার বই হয়তো অনেকেই আছে। কিন্তু সব বই যে ছোটদের ছবি আঁকায় সাহায্য করার মতো হয়, তা নয়। অনেক বইয়েরই ছবি দেখে ছোটরা আঁকায় উৎসাহিতই হয় না। সেই সব ছবি আঁকার বইয়ের ভিড়ে শিল্পী অসিত পালের 'ড্রয়িং ক্লাস জীবজন্তু-১, ২, ৩' একেবারেই অন্যরকম। বিভিন্ন জীবজন্তু, যা ছোটরা দ্যাখে চিড়িয়াখানায়, টিভিতে বা বইয়ে, সেই জীবজন্তুগুলোকে ধাপে-ধাপে কেমন করে আঁকার খাতায় ফুটিয়ে তুলবে ছোটরা, সহজভাবে দেখানো হয়েছে এই বইয়ে। আঁকার সঙ্গে ছোটরা জানতেও পারবে এক-একটি জীবজন্তু সম্পর্কে মনে রাখার মতো কিছু কথাও। সুন্দর ছাপা এই তিনটি বইয়েরই দাম ৪৫ টাকা। বইগুলো প্রকাশ করেছে ৩৫/৮ কায়স্থপাড়া মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ থেকে 'হামিংবার্ড'।

কিড আইনক্স

সল্ট লেকের 'আইনক্স সিটি সেন্টার'-এ 'দ্য আর্লি বার্ড ফ্রি মেম্বারশিপ' নিয়ে রীতিমতো হইহই কাণ্ড। তিন থেকে চোদ্দ বছর বয়সি কচিকাঁচারা পাচ্ছে সিটি সেন্টারের মুভি ক্লাবের মেম্বার হওয়ার সুযোগ। এই উপলক্ষে ২০০৪-এর নভেম্বরে সিটি সেন্টারে ছিল জমাটি মজা আর দারুণ হইহুল্লোড়। অভিনেত্রী জুন মালিয়ার সঙ্গে কচিকাঁচারা জমিয়ে আড্ডা দিল, এর পাশাপাশি 'পাপেট শো'-এর আনন্দও ছিল মনে রাখার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায়



৫০০ খুদে মেম্বারকে বিনামূল্যে মেম্বারশিপ দেওয়া হয়।

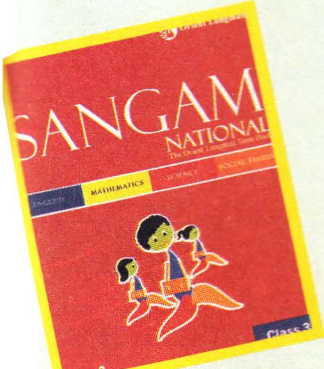
মুভি ক্লাবের মেম্বারদের জন্য আরও সুখবর, আইনক্স সিটি সেন্টারে জন্মদিনের পার্টি করতে গেলে মিলবে বিশেষ অঙ্কের টাকার ছাড়। অবশ্য বিনামূল্যে নয়, তিনশো টাকার বিনিময়ে মিলবে মেম্বারশিপের সুযোগ।

সুমন সেনগুপ্ত

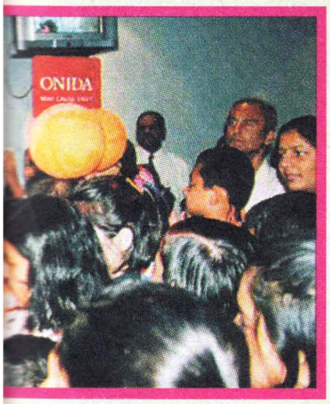


স্কুলপড়ুয়াদের জন্য ওরিয়েন্ট লংম্যান

বয়স হয়তো ছয় কি সাত। এখন থেকেই বইয়ের ভারে হাঁসফাস অবস্থা। একগাদা বইভর্তি ব্যাগ পিঠে নিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের এই কষ্ট লাঘব করার জন্য এক অভিনব



পরিকল্পনা করেছে 'দ্য ওরিয়েন্ট লংম্যান' প্রকাশন সংস্থা। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি ক্লাসে থাকবে তিনটি বই। আই সি এস সি অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের জন্য প্রতি বইয়ে চারটি বিষয়— ইংলিশ, ম্যাথমেটিক্স, সায়েন্স, সোশাল স্টাডিজ। প্রতি ক্লাসে তিনটি টার্ম। প্রতি টার্মে চারটি বিষয়ের জন্য একটি বই। পাঠ্যপুস্তকের এই সিরিজের নাম দেওয়া হয়েছে 'সঙ্গম ন্যাশনাল টার্ম বুক্স্'।



জাগলিং অ্যাকাডেমি কলকাতায়

যাঁরা জাগলিং শিখতে চান তাঁদের জন্য সুখবর। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ-এ ২ জানুয়ারি রবিবার জাগলার অভয় মিত্র শুরু করলেন 'অ্যাকাডেমি অফ জাগলিং'। জাগলিংয়ে অভয় মিত্র খুবই পরিচিত নাম। এই অ্যাকাডেমির ফলে জাগলিং অনুরাগী মানুষ যে খুবই উপকৃত হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন জাগলিং প্র্যাকটিস করলে নাকি মানুষের মস্তিষ্কের গঠন পালটে যায়, বেড়ে যায় ব্রেনের গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণ।

'বীরপুরুষ' কবিতার ১০০ বছর

কোনও বিখ্যাত মানুষের জন্মদিন-মৃত্যুদিনের বা কোনও প্রতিষ্ঠানের ১০০ বছর পালনের ঘটনা আমরা জানি। কিন্তু ছোটদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'শুভম বর্ণমালা' আয়োজন করেছিল এক অভিনব শতবর্ষ পূর্তি উৎসব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বীরপুরুষ' কবিতাটির ১০০ বছর পূর্তি উৎসব করল তারা অবনীন্দ্র সভাঘরে ২০ ডিসেম্বর সন্ধে ছ'টায়। উৎসবের সূচনা করেন প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯০৩ সালে আলমোড়ায় বসে। এই কবিতাটির কবিকণ্ঠে আবৃত্তি বাজানো হয়। বিডন স্ট্রিট শুভমের শিশুশিল্পীদের কণ্ঠে বীরপুরুষ কবিতার আবৃত্তি শ্রোতাদের মন কাড়ে। কবি তারাপদ রায়, পবিত্র সরকার, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের আলোচনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে 'বীরপুরুষ, একশো বছর পর' আলোচনাটি। এই সময়ের প্রবীণ ও নবীন কবিদের লেখায় সমৃদ্ধ শুভম বর্ণমালার 'বীরপুরুষ, শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এঁদেরই ছোটদের গ্রুপ থিয়েটারের দল 'বিডন স্ট্রিট শুভম'-এর শিশুশিল্পীরা রামমোহন মঞ্চে ৭-৯ জানুয়ারি তাদের চতুর্থ বার্ষিক নাট্য উৎসবের শেষ দিনে মঞ্চস্থ করবে 'বীরপুরুষ' কবিতার নাট্যরূপ।

গান গাইছে বার্বি ডল

বার্বি ডল গান গাইছে! আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ম্যাটেল টয়েজ় ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তৈরি করে



ফেলেছে এরকমই একজোড়া বার্বি পুতুল— বার্বি অ্যাজ প্রিন্সেস অ্যানিলিস ও বার্বি অ্যাজ মেডেন এরিকা। যমজ, চোখজুড়নো এই পুতুল দু'টি গায় দু'টি করে গান। এ-বছরের হল কাঁপানো অ্যানিমেশন ফিল্ম 'দ্য প্রিন্সেস অ্যান্ড দ্য পপার'-এর অনুকরণেই এগুলো তৈরি।



স্প্যানিশ প্রিমিয়ার লিগে রোনাল্ডিনহো (ডান দিকে)

কিক অফ

বর্ষসেরা রোনাল্ডিনহো



রোনাল্ডিনহো (মাঝখানে), শেভচেঙ্কো এবং থিয়েরি অঁরি (বাঁ দিকে)

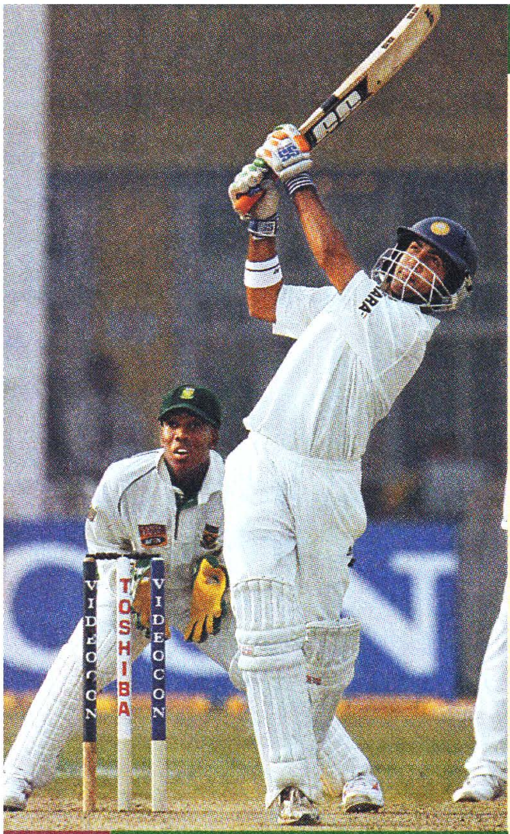
ফ্রান্সের থিয়েরি অঁরি, ইউক্রেনের আন্দ্রেই শেভচেঙ্কোকে হারিয়ে ফিফার 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার'-এর মুকুট উঠেছে ব্রাজিলের রোনাল্ডিনহোর মাথায়। জানাচ্ছেন **সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

বার্সেলোনার রোনাল্ডিনহোর ঠিক সাতদিন লাগল এ সি মিলানের আন্দ্রেই শেভচেঙ্কোর মুখের হাসি কেড়ে নিতে। ১৩ ডিসেম্বর উয়েফার 'বর্ষসেরা' হয়ে ইউরোপিয়ান ফুটবল অফ দ্য ইয়ারের ট্রফি জিতে ফুটবল দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন শেভচেঙ্কো। আর 'ইউরোপ সেরা' হওয়ার লড়াইয়ে যাঁদের হারিয়েছিলেন এই ইউক্রেনীয় সুদর্শন, তাঁদের মধ্যে রোনাল্ডিনহোও ছিলেন। অথচ ঠিক তার হপ্তাখানেক পর, জুরিখে ফিফার হেডকোয়ার্টারে এ সি মিলানের সুপার স্ট্রাইকার নন, বরং ফিফার বর্ষসেরা যুদ্ধে বাজি জিতে পেলে, গ্যারিঞ্চা, জিকো, রোমারিওদের দেশের সমৃদ্ধ ফুটবল কৌলিন্যের যোগ্য বাহক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতই করলেন রোনাল্ডিনহো।

১৯৯১ সাল থেকে ফিফা চালু করেছে বর্ষসেরার প্রতি এই সম্মান জ্ঞাপন। এবারের লড়াইটার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই অন্য মাত্রা পেয়েছিল খেতাব জয়ের চূড়ান্ত তিন দাবিদারের জন্য। মানে রোনাল্ডিনহো, থিয়েরি অঁরি এবং আন্দ্রেই শেভচেঙ্কোর জন্য! আসলে এঁদের মধ্যে থিয়েরি অঁরি ছাড়া কারও ফিফার বর্ষসেরা লড়াইয়ে চূড়ান্ত তিন 'নমিনি' হওয়ার অভিজ্ঞতাও ছিল না, খেতাবজয় তো দূরের ব্যাপার! সুতরাং তাঁদের কাছে ব্যাপারটা যে আলাদা শিরশিরানি বয়ে নিয়ে আসবে, তা তো বটেই!

শেষ হাসিটা হাসলেন ২৪ বছরের ব্রাজিলীয়ই! শুধু তাই নয়, ট্রফি হাতে জুরিখের ঝাঁ-চকচকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে রোনাল্ডিনহো বললেন, আবারও তিনি বর্ষসেরার খেতাব জিততে চেষ্টা করবেন। রোনাল্ডিনহো নাকি এক ব্যতিক্রমী ফুটবলার। পিঠ অবধি ছড়ানো কোঁকড়ানো কালো চুলের 'পনিটেল' স্পেনীয় তরুণদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হবে না! লা লিগায় রোনাল্ডিনহোর দল যা কাণ্ড করছে! এখনও অবধি ১৪টা ম্যাচ খেলেছে বার্সেলোনা এবং লিগ তালিকায় 'বার্সা', মানে বার্সেলোনা সবার উপরে। নভেম্বরেই চিরপ্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদকে তিন গোল দিয়েছেন রোনাল্ডিনহো, ডেকো, লুজেমির গিউলি, স্যামুয়েল ইটোরা। ২০০৩ সালের অগস্টে রোনাল্ডিনহো প্যারিস থেকে বার্সেলোনায় এসেছিলেন, ফুটবলদুনিয়ায় একরকম ঝড় তুলেই। তার পরের চোদ্দ মাসে রোনাল্ডিনহোর কেরিয়ার অবশ্য রীতিমতো মসৃণগতিতে এগিয়েছে। এবারে ফুটবলদুনিয়ার ১৫৭ জন জাতীয় কোচ আর ১৪৫ জন জাতীয় অধিনায়কের ভোটে রোনাল্ডিনহো হয়েছেন ২০০৪ ফিফা বর্ষসেরা। তিনি পেয়েছেন ৬২০টি ভোট। ৬৮ ভোট কম পেয়ে ফ্রান্সের থিয়েরি অঁরি দু'নম্বরে। তিনে সদ্য ইউরোপ-সেরা ইউক্রেনের আন্দ্রেই শেভচেঙ্কো পেয়েছেন ২৫৩টি ভোট। প্রথম পছন্দের ভোটের হিসেব ধরলেও রোনাল্ডিনহো অঁরির চেয়ে এগিয়ে। 'বর্ষসেরা' যেখানে পেয়েছেন ৮৯টি ভোট, ন্যাড়ামাথা ফরাসি স্ট্রাইকার সেখানে পেয়েছেন ৭৯টি।

তিনি নাকি এবার বার্সেলোনা ছেড়ে যোগ দেবেন চেল্‌সিতে! স্বয়ং রোনাল্ডিনহো অবশ্য এই খবরকে স্রেফ গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, নিউ ক্যাম্পে এই এক বছরেই চমৎকার মানিয়ে নিতে পেরেছেন। বর্ষসেরার ট্রফি হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়েই খোলা সার্টিফিকেট দিয়েছেন বার্সেলোনার সতীর্থদের। অন্য একটা ব্যাপারে ফুটবলমহল অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছে রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে আগের বর্ষসেরা ব্রাজিলীয়দের। ১৯৯৪ সেরা রোমারিও আর ১৯৯৯ সেরা রিভাল্ডোও কিন্তু বার্সেলোনায় থাকাকালীনই ফিফার বর্ষসেরা হন। এমনকী রোনাল্ডোও যখন প্রথমবারের জন্য 'ওয়ার্ল্ড ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' খেতাব পান, তখন তিনিও 'বার্সা'তেই। নিউ ক্যাম্পে এসেই কী তা হলে সাম্বা ফুটবলার মহাতারকারা ফর্মের শিখরে পৌঁছন? হয়তো তাই!



লড়াই শুরু গৌতম গম্ভীরের

২৩ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার কি পারবেন ভারতীয় ওপেনিং ব্যাটসম্যানের অভাব পূর্ণ করতে? আলোচনা করেছেন

সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

গুড লেংথ

কানপুরের গ্রিন পার্ক-এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গৌতম গম্ভীরের লড়াকু ৯৬ রানের ইনিংসটা ২৩ বছর বয়সি এই ক্রিকেটারের কেরিয়ারে নতুন বাঁক আনবে কি আনবে না, সে পরের কথা, তবে টিম ইন্ডিয়ার গড়পড়তা সমর্থককে যে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত করবে, তা হলফ করে বলা যায়। আসলে দলের ওপেনিং স্লট নিয়ে ইদানীংকালে বড্ড বেশি মাথা ঘামাতে হয়েছে 'থিঙ্কট্যাঙ্ক'কে। টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিকতম সংস্করণের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গা নিঃসন্দেহে ওপেনিং জুটি। সানি গাওস্করের দেশে এখন আর পাতে দেওয়ার মতো কোনও ওপেনার নেই, ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়! গাওস্করের আমলে তিনি নিজেই ছিলেন সবচেয়ে বড় ভরসা। কিন্তু গাওস্কর পরবর্তী প্রজন্ম ভারতীয় ওপেনিংয়ের হাল ধরতে পারল কোথায়?

ভারতীয় ক্রিকেটে নভজোৎ সিংহ সিধু এবং বীরেন্দ্র সহবাগ ছাড়া সেই অর্থে সফল ওপেনার আর পাওয়া যাচ্ছিল না। ২০০০-এর নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেই সৌরভের দলে একটা ওপেনিং স্লট সহবাগের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু আর-একজন কে হবেন, যিনি 'বীরু'র সঙ্গে জুটি বেঁধে টিম ইন্ডিয়াকে অন্তত নির্ভরতাটুকু দিতে পারবেন? গত দেড়বছরে শিবসুন্দর দাস, আকাশ চোপড়া, যুবরাজ সিংহ, মায় পার্থিব পটেলকে পর্যন্ত লড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শত্রুশিবিরের ঝড়ঝাপটা সামলাতে। এখন আদপেই 'গম্ভীর' নন এমন একজন সুদর্শন ও এন জি সি কর্মী যদি অবস্থাটা ফেরাতে পারেন, তা হলে মানতেই হবে টিম ইন্ডিয়ার গত কয়েকমাস ধরে চলতে থাকা দৈন্যদশা কাটিয়ে পুনরুত্থান স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

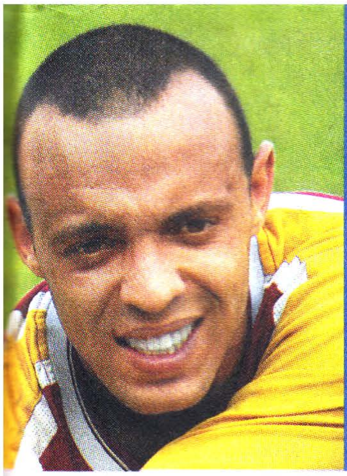
'মর্নিং শোজ দ্য ডে' — এই ইংরেজি প্রবাদটা ভাগ্যিস সবক্ষেত্রে ফলে না! তা হলে তো ইংলিশ ক্রিকেটের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব গ্রাহাম গুচের টেস্ট খেলাই হত না! জীবনের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জোড়া শূন্য করা ওই ক্রিকেটার পরে বহুবার বলেছেন, তিনি নাকি তখন ভাবতেই পারেননি যে, আর কখনও টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন! গৌতম গম্ভীরও পরে গুচের মতো এরকম বলবেন কি না কে জানে! তবে বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গৌতমের ব্যর্থতা অতটা গায়ে মাখেননি কেউ। প্রথমত, জীবনের প্রথম টেস্টে তাঁকে লড়তে হয়েছে ম্যাকগ্রা, গিলেসপি, ওয়ার্ন, ক্লার্কদের বিপক্ষে। তার উপর ওরকম পিচ! যে পিচে মাত্র আড়াই দিনেই শেষ হয়ে যায় ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা দুই ব্যাটিং লাইন আপ, সেখানে একজন আনকোরা ওপেনারের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা সত্যিই অর্থহীন। আর বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে করা ১৩৯ রান তো গৌতমের এখনও পর্যন্ত সেরা টেস্ট ইনিংস।



কোচ জন রাইটের সঙ্গে গৌতম গম্ভীর

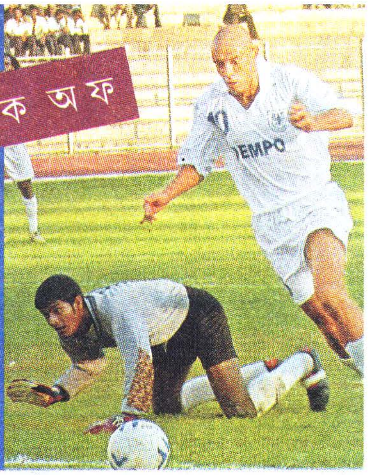
তবে টেস্ট ক্রিকেট না হলেও জাতীয় দলের নীল জার্সি গায়ে গৌতমের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে গিয়েছিল ২০০৩-এর এপ্রিলেই। বিশ্বকাপের ঠিক পরপরই বাংলাদেশে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে টিম ইন্ডিয়া গিয়েছিল প্রথম একাদশের কয়েকজনকে ছাড়াই। সচিন, দ্রাবিড়হীন সেই দলের ওপেনার হিসেবে দিল্লির এই ২৩ বছর বয়সি ক্রিকেটার কিন্তু খুব একটা হতাশ করেননি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অর্ধশতরানও করেছিলেন। এবার টেস্ট দলে হঠাৎ জায়গা পেয়ে ভীষণ রোমাঞ্চিত এই যুবকটি। ওঁর অকপট স্বীকারোক্তি, "টেস্ট ক্রিকেটই তো আসল জায়গা। অপেক্ষা করে ছিলাম কবে সেই দিনটা আসবে, যেদিন ভারতের হয়ে টেস্টে ওপেন করব!"

দিল্লির হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে আর উত্তরাঞ্চলের হয়ে দলীপ, দেওধর ট্রফিতে প্রশ্নাতীত সাফল্য ওঁর জাতীয় দলে ঢোকার রাস্তা মসৃণ করে দিয়েছিল ভালভাবেই। আর তাই রাহুল দ্রাবিড়ের এই অন্ধ ভক্তটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মূল স্রোতে ঢুকে পড়াটা আদৌ অবাক হওয়ার ব্যাপার নয়। এখন দেখতে হবে প্রিয় খেলোয়াড় মার্ক টেলরের মতো ইনিও দেশকে নির্ভরতা দিতে পারেন কি না। কানপুরের গ্রিন পার্কে কি তারই ইঙ্গিত ছিল গৌতমের ব্যাটিংয়ে? হতেও পারে!



জীবনের 'শেষ লড়াই'ও জিতে গেলেন জুনিয়র

কিক অফ



ভারতের ফুটবলজগতে জুনিয়রের অবদান অপরিসীম। লিখেছেন **সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

ক্রিশ্চিয়ানো ডি লিমা জুনিয়র ২০০৩-এর ডিসেম্বরে যখন এই শহরে পা রাখেন, তখন বোধ হয় ভাবতেই পারেননি যে, একদিন তিনি এত বড় 'খবর' হয়ে যাবেন! যদিও এদেশের ফুটবল মাঠে জুনিয়রের কীর্তি এককথায় চোখধাঁধানো। অবিশ্বাস্য স্ট্রাইক রেট, আর সেজন্যই জুনিয়রের জনপ্রিয়তা পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল। যখন ২০০৩-০৪ মরশুমে জাতীয় লিগে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরে প্রথম মাঠে নামলেন রোনাল্ডোর দেশের স্ট্রাইকার, তখন লাল-হলুদ বিগ্রেড রীতিমতো খাবি খাচ্ছে জাতীয় লিগে! তারিখটা ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩। সেদিন ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে গোয়ার হেভিওয়েট ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্স। লিগে সুভাষ ভৌমিকের দলের চতুর্থ ম্যাচ। তার আগের তিনটি ম্যাচ সালগাঁওকরের কাছে হেরেছে আর ভাস্কো, জেসিটি-র কাছে ড্র করেছে তারা। চার্চিলের বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকেই লাল-হলুদ জনতার অবধারিত 'টার্গেট' সুভাষ ভৌমিক! খড়কুটোর মতো ওঁর বাঁচার শেষ আশ্রয়, নতুন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ২৪ বছর বয়সের এই খেলোয়াড়কে সুভাষ ইস্টবেঙ্গলে এনেছেন আসল কাজটি করার জন্য।

নিজের কাজ জুনিয়র শুরু করে দিলেন একেবারে প্রথম ম্যাচেই। ইয়াকুবু, নোয়েল, রক ব্যারেটো সমৃদ্ধ চার্চিলকে ইস্টবেঙ্গল হারায় ২-১ গোলে। পেনাল্টি থেকে জুনিয়রের করা গোল ইস্টবেঙ্গলের লিগ অভিযানে বিরাট একটা বাঁক এনে দেয়। তাদের তৃতীয়বার জাতীয় লিগ জয়ে ফুটবলমহল একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল জুনিয়রের কৃতিত্ব। মাত্র ১৮টি ম্যাচ খেলে জাতীয় লিগে জুনিয়র করেছিলেন ১৫টি গোল। শুধু তাই নয়, ইয়াকুবু, ডুডু, অসীম বিশ্বাসদের মতো সেরা স্ট্রাইকারদের পিছনে ফেলে লিগের সর্বোচ্চ স্কোরারও হয়ে গিয়েছিলেন ব্রাজিলীয় এই স্ট্রাইকার। এবারের ফেডারেশন কাপ ফাইনালে বাঙ্গালোরের কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারিয়ে ডেম্পোর ভারতসেরা হওয়ার ছবির পাশাপাশি জুনিয়রকেও ভুলবেন না ফুটবলপ্রেমীরা।



ফুটবলমাঠে খেলতে-খেলতেই মারা যাওয়ার উদাহরণ অনেক আছে। এই বছর অক্টোবর মাসে ব্রাজিলের সার্জিনহো মারা যান সাও পাওলোর বিপক্ষে ম্যাচ চলার সময়। তার আগের বছর ক্যামেরুনের জাতীয় দলের তারকা মার্ক ভিভিয়ান ফো হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়েন কনফেডারেশন্স কাপের সেমিফাইনাল চলার সময়। ভারতীয় ফুটবলেও এমন ঘটনা একাধিক। তিনের দশকে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে দীপক করাতি, ১৯৯৩ সালে সন্তোষ ট্রফি চলাকালীন রেলওয়েজ-এর সঞ্জীব দত্ত—এইরকম অনেক উদাহরণ আছে।

এবারের ফেড কাপ ফাইনালে মোহনবাগান গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে সংঘর্ষের পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জুনিয়র। সতীর্থরা জুনিয়রের মুখে মুখ দিয়ে শ্বাসযন্ত্র সচল করার চেষ্টা করেন। তারপর মাঠ থেকেই অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। কিন্তু মাঠেই বা কেন প্রাথমিক চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থা ছিল না বা জুনিয়রকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার পর কেন অক্সিজেন সিলিন্ডার চালু করতে অযথা দেরি হল (এমনটাই অভিযোগ ডেম্পোর ফুটবলারদের)! এসব প্রশ্নের উত্তরে কর্তাদের মুখে কিন্তু কুলুপ! প্রশ্ন উঠেছে ম্যাচের রেফারি বালুকে নিয়েও। সুব্রত পালের কড়া ট্যাক্‌ল সত্ত্বেও কেন তিনি এই গোলকিপারকে লাল কার্ড দেখালেন না!

এদেশের মাটিতে জুনিয়রের কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত বর্ণময়। গত বছর জাতীয় লিগ ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এ এফ সি কাপের ম্যাচগুলোয় তিনি নিয়মিতই গোল করেছিলেন। প্রিলিমিনারি রাউন্ডেও ৫টি ম্যাচে ৬টিগোল। এর পর জুনিয়র আন্তরাজ্য ছাড়পত্র পেয়ে চলে গেলেন গোয়ায়। আগে কোনওদিন ফেড কাপ জেতেনি ডেম্পো। তাই এবার বাঙ্গালোরে এসেছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্নের কেন্দ্রে ছিলেন সেই জুনিয়রই! মহীন্দ্র ইউনাইটেড, সালগাঁওকর, ইস্টবেঙ্গলের মতো টিমগুলো ডাহা ফেল যেখানে, সেখানে ডেম্পো কিন্তু তরতর করে এগিয়ে গেল জুনিয়র, রন্টি, মার্টিন্সদের কাঁধে চেপেই। ফাইনালে মোহনবাগানকে সামলানোর আগে রন্টি ও জুনিয়রের মধ্যে ইঁদুরদৌড় চলছিল সর্বোচ্চ স্কোরার হওয়ার জন্য। রন্টি ৫, জুনিয়র ৩। না, হারেননি জুনিয়র, জীবনের শেষ লড়াইয়েও জিতলেন। ওঁর জোড়া গোলেই মোহনবাগানের ফেড কাপ দৌড় শেষ। কলকাতার ফুটবলমাঠে আত্মপ্রকাশের দিন জুনিয়র জনতার 'কুর্নিশ' কুড়িয়েছিলেন। আর চিরবিদায় নিলেন যেদিন, সেদিনও ওঁর সামনে নতজানু হতে হল সকলকে।

ফ্রি স্টাইল



বিশ্বজয়ী হরিকৃষ্ণ

যাঁকে আদর্শ বলে মেনে উঠে এসেছেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন সে আর আশ্চর্য কী! ১৯৮৭ সালে প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে সেই কৃতিত্বের অধিকারী হলেন পাণ্ডিয়ালা হরিকৃষ্ণ। মাঝে অবশ্য ২০০২ সালে কোনেরু হাম্পি মেয়েদের জুনিয়র দাবায় বিশ্বখেতাব জিতেছিলেন। প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে হরিকৃষ্ণর বিপক্ষে ছিলেন শীর্ষ বাছাই ফেভারিট হাঙ্গারির ফেরেঙ্ক বার্কস্। কিন্তু মাত্র ৫০ চালেই ম্যাচ ড্র করে টুর্নামেন্ট জিতে নেন ১৮ বছরের হরিকৃষ্ণ। হায়দরাবাদের অম্বেডকর ওপেন ইউনিভার্সিটির ছাত্রটি এখন জানুয়ারি মাসে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভাল খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সায়নের ব্যাট

বয়স এখনও ১৫ ছোঁয়নি। দুর্গাপুরের সায়নশেখর মণ্ডল অনূর্ধ্ব ১৫ পলি উমরিগড় ট্রফিতে বাংলার হয়ে দু'-দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করে গড়েছে নতুন জাতীয় রেকর্ড। ত্রিপুরার বিপক্ষে ২১৫ রানের বিশাল একটি ইনিংস খেলার পর সায়ন সিকিমের বিপক্ষেও ২১৮ রান করে। এই পর্যায়ের ক্রিকেটে এত বড় রানের ইনিংস আগে কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের ব্যাট থেকে আসেনি। গতবার চোদ্দজনের দলে ঠাঁই হয়নি। এবার সুযোগ পেয়েই জাতীয় রেকর্ড। পাঁচটি ম্যাচে দু'টি দ্বিশত রান ও একটি শতরানসহ ৫৬৬ রান করে ফেলা এই ক্রিকেটারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই।

সোনার ছেলে



জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ের ছেলে হরিশঙ্কর রায়ের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ হল। সিঙ্গাপুরে এশিয়ান অলস্টার মিটে সাফল্য পাওয়ার পর হরিশঙ্কর এবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে জুনিয়র কমনওয়েলথ গেম্স থেকে হাইজাম্পে সোনা জিতে আনলেন। এই প্রথম কোনও ভারতীয় অ্যাথলিট জুনিয়র কমনওয়েলথ গেমসে সোনা পেলেন। সিঙ্গাপুরে অলস্টার মিটে ২.২৫ মিটার লাফিয়েছিলেন হরিশঙ্কর, ভারতীয় হাইজাম্পারদের ক্ষেত্রে যেটা রেকর্ড। কমনওয়েলথে তিনি ২.১৩ মিটার লাফিয়েছেন। অতিরিক্ত ঠান্ডার ফলে মেলবোর্নে নিজের সেরা রেকর্ড ধরে রাখতে পারেননি। সোনা জিতে এসে ধূপজোরা গ্রামের সোনার ছেলে হরিশঙ্করের লক্ষ্য এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স ও এশিয়ান গেম্স।



বর্ষসেরা কারিমি

ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের নাম সবাই জেনে গেছে। কিন্তু কে হয়েছেন এশিয়ার বর্ষসেরা ফুটবলার? এবারও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন-এর বিচারে বর্ষসেরার মুকুট জয় করে নিয়েছেন ইরানের এক ফুটবলার, স্ট্রাইকার আলি কারিমি। এই নিয়ে পরপর দু'বার ইরানি ফুটবলাররাই এশীয়-সেরার মুকুট ছিনিয়ে নিলেন। কারিমির জন্যই এবার এশিয়ান কাপে তৃতীয় স্থান পেয়েছে ইরান। সেরার দৌড়ে বাহরিনের স্ট্রাইকার আলা হুবেইল ও জাপানের মিডফিল্ডার নাকামুরাকে পিছনে ফেলে দেন তিনি। এই সাফল্যের পরই ইতালির পেরুজিয়া এবং স্পেনের আটলাটিকো মাদ্রিদ কারিমির দিকে হাত বাড়িয়েছে।

দামি কোচ



পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের প্র্যাকটিস করাচ্ছেন কোচ বব উলমার (মাঝখানে)

পাকিস্তান দলের হাল ধরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন 'ল্যাপটপ' কোচ বব উলমার। এই মুহূর্তে তিনিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে দামি কোচ। পাক ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে উলমার বছরে ৮০ হাজার ডলার বেতনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়াও পাক দলের প্রতিটি ম্যাচ ও সিরিজের সাফল্যের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন তিনি। উলমার দায়িত্ব নেওয়ার পর পাকিস্তান টিম রাতারাতি অনেক বদলে গেছে। পরপর চারটি ম্যাচেই ভারতের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়েছেন ইনজামামরা। শুধু ভারতকে হারিয়েই থামতে চান না নতুন পাক কোচ। "আমি চাই পাকিস্তান এমন ক্রিকেট খেলুক যাতে বিশ্বের যে-কোনও দলকেই হারাতে পারে," বলেছেন বব উলমার।

চন্দন রুদ্র



আপনার পেশার বন্ধু, বাচ্চাদের খিদের বন্ধু আর শ্বশুরবাড়ির বন্ধু।
আপনিও এর বন্ধু হয়ে যান।

রেডি-টু-ইট কারির ও রাইস এমটিআর সম্ভার।



চানা মসালা, রাজমা মসালা, পালক পনীর, নবরতন কোর্মা, ডাল মাখনি, জিরা রাইস, সাম্বার রাইস, রাজমা রাইস, লেমন রাইস... যা চাই প্রায় সবকিছুই। তার ওপর এতে আছে বিখ্যাত সেই এমটিআর ছাপ: স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি আর দরাজ পরিমাণে পরিবেশিত সুস্বাদু খাবার। আজই নিয়ে আসুন। নিমেষে এরা আপনার জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। ঠিক বন্ধুর মতোই।

• জিরা রাইস • ডাল মাখনি • ভেজিটেবল পোলাও • চানা মসালা • নবরতন কোর্মা • পনির মাখনি

ANANDAMELA JANUARY 2005 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 RS. 10.00
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06

a UTV venture

GINI & JONY
Presents



দ্যাখো তো কে মাম্মিকে দিচ্ছে নতুন বাড়ি!

দ্যাখো আর জেতো* বিকেল 4টা থেকে রাত 8টা।

হাঙ্গামা টিভি-তে জেতার ব্যাপারটা খুব সহজ। ব্যস্, রোজ বিকেল 4টা থেকে রাত ৪-টা অব্দি হাঙ্গামা টিভি দ্যাখো আর প্রিয় মা-বাবার জন্য জিততে থাকো নানান ফ্ল্যাট, কার থেকে মালয়েশিয়া সফরের মতো অনেক চমকপ্রদ ও আকর্ষক উপহার। বেশ তো, দ্যাখো আর জেতো ! প্রতিযোগিতার বিবরণ নীচে দেওয়া হল .

Associate Sponsor ADD Gel ACHIEVER

Holiday Sponsor KESHAV Keshav Travels

*শর্তাবলি প্রযোজ্য। নিয়ম ও নির্দেশাবলির বিশদ জানতে লগ অন করুন : www.hungamatv.com

JWT.1670.2004

নিজের জন্যে 12 অঙ্কের লাকি নম্বরটা কীভাবে হিসেব করবে?
প্রথম 6টি অঙ্ক তোমার মামণির জন্মদিন আর পরের 6টি অঙ্ক তোমার বাপীর জন্মদিন দেখিয়ে দেবে। বেশ, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো, তোমার মায়ের জন্মদিন 25 সেপ্টেম্বর 1971 আর তোমার বাপীর জন্মদিন 26 ডিসেম্বর 1966, তবে তোমার লাকি নম্বর হবে 250971261266। এবার বুঝলে তো? তা'লে এখানে দেওয়া কোড ভরো, হাঙ্গামা টিভি দ্যাখো আর জেতো !!

kids ka apna indian channel
Hungama TV™

নাম :

কনটেস্ট কোড :

D	D	M	M	Y	Y	D	D	M	M	Y	Y
মা						বাবা					